নবনীতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নবনীতা

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

সমস্তটা বাড়ি জুড়ে বাদুড়ের পাখার মতো দীর্ঘ অন্ধকার ঝুলছে। দেয়ালগুলো যেন ভয়ে ঠান্ডা, সরে দাঁড়িয়েছে এক পাশে। এখানে-সেখানে কালো, পিচ্ছিল কতোগুলি ছায়া।

নিশীথ আর দাঁড়ালো না, দরজা যখন এতক্ষণে খোলা পেয়েছে। নিচেটা নিঝুম, ঘুমিয়ে পড়বার মতো যদিও রাত হয়নি। রান্নাঘরে সবাই খেতে বসে থাকবে হয়তো। ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই, নিশীথ সোজা উপরে উঠে গেলো।

এক চিলতে আলো নেই কোথাও। বোজানো বইয়ের মতো নিঃশব্দ। পা টিপে-টিপে লম্বা বারান্দাটা নিশীথ পার হয়ে গেলো : শেষ প্রান্তে নবনীতার ঘর, ইচ্ছে করো তো, কোটর বলতে পারো। ঘন ডানায় উষ্ণ, সংক্ষিপ্ত।

'কে ?' নবনীতা শুয়ে ছিলো, ঘুমের মধ্যে থেকে আচমকা কথা কয়ে উঠলো।

মেঝের উপর সংকুচিত বিছানা, ও-পাশে টেবিলে-চেয়ারে সঙ্কীর্ণ একটুখানি পড়ার জায়গা। গরিব, এলোমেলো ঘর, বই-খাতা ও শাড়িতে-সেমিজে একটা প্রকাণ্ড হট্টগোল। এদিকে সেলাইয়ের কলের কাছে স্তূপীকৃত কতোগুলি কাটা কাপড়ের টুকরো, ওদিকে ছেঁড়া তারের জটিলতায় একটা ভাঙা এস্রাজ নীরবে করছে আর্তনাদ। বোঝা যাচ্ছিলো, কলেজ থেকে ফিরে এসে কোনো কাজে আজ আর নবনীর মন বসেনি। পিঠ সোজা রেখে টেবিলে বসে পড়তে গিয়ে মেরুদণ্ড তার ভেঙে পড়েছে বিছানায়। শিয়রের কাছে তলিয়ে-দেয়া লণ্ঠনের শিখাটা মিটমিট করছে, কোথাকার কার নোট-টোকা চটি একটা এক্সারসাইজ-খাতা এলিয়ে পড়েছে বুকের একপাশে। সমস্ত শরীরে সুন্দর একটি শ্রান্তির মাধুরী।

'কে ?' খানিক ভয়, খানিক আশা, ধূসর গলায় নবনীতা কথা বললো।

শান্ত জলের উপর শীতল জ্যোৎস্না পড়েছে, নবনীতার ঘুমন্ত এই শরীর। বনের কিনারে রাত্রির প্রথম ছায়ার মতো করুণ। পায়ের পাতা

দুটির উপর থেকে শাড়ির গুচ্ছ-গুচ্ছ সুষমা বাহুর ধার পর্যন্ত উঠে গেছে; চুল সে আজ বাঁধেনি, শিশির-ঝরা কালো রাত্রির মতো সে-চুল, তার এই ঘুমের মতো ঠাণ্ডা। রিক্ত, সম্পূর্ণ একখানি হাত আলস্যে রয়েছে এলিয়ে, যেন অনেক স্বপ্ন দিয়ে তৈরি; তার স্তিমিত বুকে যেন মৃত্যুর কোমলতা।

নবনীতা জেগে উঠলো, ক্ষিপ্র হাতে লণ্ঠনটা দিলে উসকে।

'তুমি? সে কি?'

'তিনবারের বার ঢুকতে পেরেছি বাড়িতে।' নিশীথ বলীয়ান দীপ্তিতে ঝকঝক করে উঠলো : 'এখন কত বারের চেষ্টায় বাড়ি থেকে বেরোতে পারি সেই হয়েছে ভাবনা।'

'কখন এসেছ?'

'সন্ধেসন্ধি।'

'তোমাদের পোস্ট-গ্রাজুয়েট তো আজ ছুটি। কোথায় নাকি কি খেলায় জিতেছ শুনলাম।'

'ছুটি কোথায়!' নিশীথ হাসলো : 'আসল খেলা তো এখনো ড্র যাচ্ছে।'

'কলেজ নেই,' নবনীতা গাম্ভীর্যের ভান করলে : 'মিছিমিছি তবে এ-পাড়ায় এসেছ কেন?'

'তার ওপরে আজ আবার ট্র্যাম-স্ট্রাইক।'

'সত্যিই তো!' নবনীতা বিরক্ত হলো, কিম্বা বিস্মিত হলো।

'তবু, একবার যখন আসবো মনে করলুম, আশ্চর্য, ঠিক চলে এলুম, নবনী।'

'এসেছ তো বলছ সন্ধের সময়!'

'হ্যাঁ, ঢুকতে যাবো, যোগীনবাবু, তোমার মেজকাকা মুখের ওপর দরজাটা সটান বন্ধ করে দিলেন।'

'বলো কী?' নবনীতা বিশীর্ণ হয়ে গেলো।

'তাই বলে দরজায় আমি কপাল কুটলুম ভেবো না, যে করে হোক

ঢুকবোই, এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে বারে-বারে এসে ফাঁক খুঁজতে লাগলুম। এতক্ষণে, রাত্রে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, দরজাটা খোলা পেয়েছি।'

'বীর বলতে হবে,' নবনীতা মৃদু অথচ নিষ্ঠুর গলায় বললে, 'কিন্তু, দরজাটা ভেঙে দিতে পারলে কই?'

কথাটা নিশীথকে একটা ধাক্কা দিলে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, 'যুদ্ধে জেতাটাই হচ্ছে বড়ো কথা, সেটা সম্মুখ-যুদ্ধ না আর-কিছু তা দেখে কোনো লাভ নেই।'

'এই তোমার যুদ্ধ-জয়ের নমুনা?'

'প্রকাণ্ড যুদ্ধ-জয়। এই রাত্রে তোমাকে যে দেখলুম, আলগোছে ঘুমিয়ে রয়েছ, দূর-থেকে-শোনা বাঁশির সুরের মতো করুণ, ক্লান্ত তোমার শরীর—কত সংগ্রাম, কত সাধনা করে তবে তা দেখা যায়।' নিশীথ দরজা থেকে দেয়ালের দিকে সরে এলো: 'আবার যে একলা ফিরে যাবো, অনেক দীর্ঘ পথ ভেঙে-ভেঙে, তা জেনেও তোমাকে দেখতে এলুম, নবনী।'

'একলা ফিরে যাবে!' নবনীতা তার পড়ার টেবিলের কাছে সরে এসে এটা-ওটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে-করতে উদাসীনের মতো বললে, 'তাই যাও না।'

'বলো কি? এক্ষুনি?'

'নিশ্চয়।'

'সে কি? সামান্য একটু বসতে দেবে না? জানো, সমস্তক্ষণ দু পায়ে দাঁড়িয়ে আছি! আর কিছু না হোক, নিতান্ত এক গ্লাশ জল?'

'কোনো দরকার নেই। তোমার যা কাজ ছিলো তা তো হয়ে গেছে।'

'আমার কাজ!'

'হ্যাঁ, রাত্রে এসে আমাকে একবার দেখা,' চোখের কোণে নবনীতার দৃষ্টি একটু কুটিল হয়ে উঠেছে: 'আমার এই আলগোছে ঘুমিয়ে-থাকাকে। আর কী চাই?'

'তুমি ঠাট্টা করছ, নবনী।'

'না, ঠাট্টা করবার আমার সময় নেই।' নবনীতা এবার দস্তুরমতো টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে এনে বসলো, ভঙ্গিতে একটা নির্লিপ্ত ঋজুতা আনলে : 'তুমি এবার যাও, আমার পড়া আছে।'

'পড়া!'

'হ্যাঁ।' নবনীতা সত্যি-সত্যি পৃষ্ঠা উলটোলো।

নিশীথ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে, শূন্যের উপর।

'আমাকে বটানির নোট পড়তে দেখার মধ্যে কোনো কবিতা নেই, তুমি এবার যেতে পারো। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কী?'

'যেতে তো হবেই জানি, তবু—'

'সংসারে আসাটা বড়ো নয়, যাওয়াটাই মহত্তরো।' নবনীতা চেয়ারটাতে ঘুরে বসলো : 'তুমি যাও, একলা, অনেক দীর্ঘ পথ ভেঙে-ভেঙে, আমার জানলাতে বসে তাই বরং আমি দেখি।'

'তুমি যে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচো।' নিশীথ ম্লান হাসলো।

'ঢের হয়েছে, আমাকে আর তোমার বাঁচাতে হবে না। নিজে আগে বাঁচো, নিজে বাঁচলে তবে আর-সব।'

'তবে বলতে চাও, এখান থেকে, তোমার থেকে চলে যেতে পারলেই আমার সুখ।'

'নিশ্চয়, যে পালায় সে-ই তো বাঁচে।' নবনীতা বিদ্রূপে ঈষৎ ঝলসে উঠলো : 'নইলে কে এখানে তোমাকে পাথরের বাটিতে করে দুধ-কলা খাওয়াবে বলো!'

'কিন্তু কতোদূর আমাকে যেতে হবে তার খেয়াল রাখো? কোথায় তোমার এই বাদুড়বাগান, আর কোথায় সেই মনোহরপুকুর।'

'খবরের কাগজে কর্পোরেশানকে গাল দাও!'

'না, কাউকে গাল দেবো না। যেতেই হবে একান্ত।'

'কেননা,' নবনীতা বইয়ের গহ্বরে চোখ নামিয়ে আনলো : 'কেননা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকায় তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে

দেয়ালের একখানা ইঁটও তুমি আলগা করতে পারবে না। যাবেই তো একশো বার। মিছিমিছি আর তবে দাঁড়িয়ে কেন?'

'তবু, একা-একা এতটা রাস্তা! একবার ভাবো আমার দশা।'

'কি করবো, আমি তোমাকে সঙ্গী দেবো কোত্থেকে?' নবনীতা যেন তার অস্তিত্বের গভীর অন্তস্তল থেকে বললে, 'তবু তো তোমার পথ আছে, তুমি চলতে পারছ। তুমি তবে আর একা কোথায়? কিন্তু ভাবো একবার আমাকে, আমার একাকীত্ব! শুধু দেয়াল আর আমি।' নবনীতা হঠাৎ দ্রুত ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'এ-দেয়াল তুমি ভেঙে ফেলতে পারো? আনতে পারো এখানে ঘর-ছাড়া খোলা আকাশের ঢেউ?'

নিশীথ নির্জীব গলায় বললে, 'বড্ড যে বনেদি দেয়াল, অনেক নিচে পর্যন্ত তার ভিৎ, মজবুত গাঁথুনি, অনেক আচার, অনেক কুসংস্কারের। সহজে টলতে চায় না।'

বিতৃষ্ণায় নবনীতার মুখ নিষ্প্রভ হয়ে এলো। বললে, 'ও তো এক ফুঁয়ে ধ্বসে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু দেখছ তো, বাইরে থেকে আর কম আঘাত করছি না।' নিশীথকে অত্যন্ত ছোট, শীর্ণ দেখালো।

'বেচারা! তবু এক কণা চুনও খসলো না, যে-দেয়াল সেই দেয়াল। তোমার জন্যে আমার এত কষ্ট হয়, নিশীথ। কি আর করবে? বাড়ি যাও, রাত হলো।'

নবনীতা কথার সুরে সমাপ্তির রেখা টানলে।

'তবু, আবার যদি না আসতে বলো, কি করে যাই?' শিথিল পায়ে নিশীথ একটুখানি এগিয়ে এলো।

'আবার আসবে বৈকি।' নবনীতা মৃদু হাসলো : 'না বললেও তো আসবে।'

'তবে তুমি চাও না আমি আসি।' নিশীথের হৃৎপিণ্ড যেন কে অন্ধকারে মাড়িয়ে দিলে।

'পাগল!' নবনীতা সর্বাঙ্গে ছটফট করে উঠলো : 'তবু, তুমি আসবে বলেই তো আমার জানলা এখনো খোলা আছে, এক-আধ ঝলক এখনো হাওয়া আসে, দুয়েকটা তারা দেখতে পাই, নইলে কবে দেয়ালের দেশে ঠান্ডা পাথর হয়ে যেতাম।' নবনীতা আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো, ঢোঁক গিলে বললে, 'কিন্তু রিক্ত হাতে এই আসা, আবার রিক্ত হাতে এই ফিরে যাওয়া—এ আর আমার ভালো লাগে না।'

নিশীথ তখনো দাঁড়িয়ে। আরো কিছুক্ষণ থাকবে, না, চলে যাবে ঠিক করতে পারছে না।

নবনীতা অকস্মাৎ রূঢ় গলায় বললে, 'কী এখনো দাঁড়িয়ে আছ বোকার মতো? পালাও। পালাও বলছি।'

ভূমিকম্পে বাড়িটা সত্যি দুলছে কি না ভালো করে ঠাহর না করেই নিশীথ দ্রুত, স্খলিত পায়ে নিচে নেমে গেলো।

[দুই]

কিন্তু গলির মোড় পেরিয়ে কয়েক পা এগোতে-না-এগোতেই কি ভেবে নিশীথ ফিরলে।

পায়ের নিচে সমস্ত পথ যেন বাঁশির মতো বেজে উঠেছে। স্তব্ধ, ধূসর সব পথ। রাত্রি থেকে দিনের দিকে ধাববান। আদিগন্ত।

পৃথিবীকে হঠাৎ তার খুব বড়ো মনে হলো : অনেক আশা, অজস্র আশ্রয়—আকাশে যেমন ডানা-মেলে-দেয়া পাখি। গায়ে এসেছে দুর্বার শক্তি, রক্তে ক্ষুরধার নিষ্ঠুরতা। সে এখন কী না করতে পারে সংসারে?

সদরে খিল পড়বার তখনো কথা নয়। আশে-পাশে কোথাও দৃকপাত না করে নিশীথ উপরে উঠে গেলো।

সেই নবনীতার ঘর। বধির, বন্দী। তখন যেমন দেখেছিল।

নবনীতা টেবিল ঘেঁষে চেয়ারে তেমনি বসে আছে, দু কনুইয়ের

ভর রেখে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে। সমস্ত ভঙ্গিটা কান্নার চেয়েও করুণ, অসহায়। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে, খানিকটা চেয়ারের হাতলে, খানিক পিঠের পাশ ঘেঁষে মেঝের উপর। ঘাড়ের দিকের সেমিজের প্রান্তটা পিঠের অনেকটা পর্যন্ত নামানো, তার উপর আবাঁধা চুলের স্ফীতকায় বিশৃঙ্খলা। লণ্ঠনের বিবর্ণ ঘোলাটে আলোয় সমস্ত ঘর ভারি দরিদ্র, লজ্জিত দেখাচ্ছে।

নিশীথের পায়ের শব্দ বুঝি এবার শোনা গেলো না। এগিয়ে এসে নবনীর অর্ধেক-অনাবৃত পিঠের উপর সে হাত রাখলে।

নবনীতা আমর্মমূল চমকে উঠলো। যে-ছোঁয়ায় শুকনো কঠিন বাকল ছিঁড়ে নতুন মঞ্জরী দেখা দেয়।

কোনো কথা সে বলতে পারলো না, এত অসম্ভব অবাক হয়ে গেছে নবনীতা। তার চেয়েও বেশি, তার এই ভঙ্গুর, দুর্বল ভঙ্গিতে সে ধরা পড়ে গেছে। তার সেই পরিচ্ছন্ন দীপ্তির পরে ঘনিয়ে-আসা এই কুহেলিকা। নবনীতা তার অশ্রু-আতুর জিজ্ঞাসু চোখ মেলে নিশীথকে একবার দেখলো।

সে-মুখের কৃশ, করুণ পবিত্রতা নিশীথকে আচ্ছন্ন করলে, আরতির ধূপের ধোঁয়ার মতো। তার কেবল মনে হলো প্রতিমার মতো প্রশান্ত, নির্লিপ্ত এই মুখ—যে-মুখে ট্র্যাজিডির প্রচ্ছন্ন ছায়া পড়েছে—এই মুখেই নবনীতাকে মানায়। তারাখচিত রাত্রির রহস্যে তাকে নয়, নয় দিনের আগ্নেয় অনাবরণে, শুধু বীতরাগ ধূসর গোধূলিতে।

'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, নবনী।'

অসিলেখার মতো নবনীতার শরীর ঝিলকিয়ে উঠলো। স্বপ্ন দেখছে কিনা ঠাহর করবার জন্যে টেবিলের কাঠটা সে চেপে ধরলো শক্ত করে।

'নিয়ে যেতে এসেছি।' নিশীথ পুনরুক্তি করলে।

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, বলছিলে না, আমাকে তুমি সঙ্গী দেবে কোত্থেকে?' নিশীথ

তাকে মৃদু নাড়া দিলে : 'ভয় নেই, পেয়ে গেছি সঙ্গী। পথের, বিপথের।'

'আমি?' নবনীতা বাঁ হাতের মধ্যমা দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করলে।

'আর কে আছে?'

আমাকে তুমি নিয়ে যেতে এসেছ?'

'কী মনে হয়?'

'আজই?'

'এক্ষুনি।'

'দাঁড়াও, আমি ঠিক ভাবতে পাচ্ছি না।' নবনীতার নিচেকার চোখের পাতার প্রান্তে জল ভেঙে পড়েছে : 'মৃত্যু ছাড়া আমাকে কেউ এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে এ আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি, তুমি সত্যি বলছ?'

'আমরা একদিন মরবো, এর চেয়েও সত্যি।'

'এরা যদি আমাকে মারতো, তা হলেও আমি বোধহয় সহ্য করতে পারতুম,' নবনীতা হঠাৎ দু হাতে তার মুখ ঢাকলো : 'কিন্তু এদের সব কথা, লোহার শলার মুখে আগুনের ছ্যাঁকার মতো—বিষাক্ত, তীক্ষ্ণ সব বাক্যবাণ। এ আর আমি সইতে পারছি না।'

'তাই তো তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' নিশীথ নির্ভীক, বলোদ্ধত একটা ভঙ্গি করলে।

রাত্রির অরণ্যের মতো নবনীতা মর্মরিত হয়ে উঠলো। আঁচলটা সে তাড়াতাড়ি গায়ের উপর আনলো গুটিয়ে, চুলের শৈথিল্যটা গুচ্ছীকৃত করলে, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো অলক্ষ্যে। বললে, 'কোথায়?'

'পৃথিবীতে অনেক জায়গা, নবনী।'

নবনীতা মুখোমুখি একবার নিশীথকে দেখলো, হয়তো বা একটু উলঙ্গ, অনাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। সে-মুখে সারল্যের সীমা নেই, কিন্তু কমনীয়

রেখায় পেলব দুর্বলতা রয়েছে লুকিয়ে। সমস্ত ভঙ্গিটা যেন প্রতীক্ষায় কেমন নম্র, অবসন্ন; প্রতিজ্ঞায় প্রখর, উদ্দীপ্ত নয়।

তবু, সাহস করে নবনীতা আবার জিগগেস করলে : 'তবু, কোথায়, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে বলো?'

'কোথাও না। আমাদের যাত্রার কি শেষ আছে যে তাকে বিশেষ কোনো জায়গায় এনে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ করে তুলবো? আমাদের জন্যে পথ, আমাদের জন্যে ধূসর অনিশ্চয়তা।'

'হেঁয়ালি রাখো।' নবনীতা ধমক দিয়ে উঠলো : 'আপাততো কোথায় নিয়ে যেতে চাও?'

নিশীথ পড়লো ফাঁপরে। এত বড়ো পৃথিবীতে এত অকস্মাৎ কোথাও যেন সে পথ খুঁজে পেলো না।

'তুমি রাত করে ঠাট্টা করতে আসোনি নিশ্চয়ই?' নবনীতা বললে।

'ককখনো না।'

'আর এক্ষুনি, এই মুহূর্তেই তো আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ বললে।'

'নিশ্চয়।' নিশীথকে বলতে হলো। নবনীতার চেহারা দেখে তার প্রচ্ছন্ন ভয় করতে লাগলো। শান্ত, সবুজ আকাশে লাল একটা ঝড় উঠেছে লেলিহান হয়ে। তার দেহ বহুতন্ত্রীকা বীণার মতো গীত-তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। ধনুকের মতো ধারালো তার ভুরু।

'তবে কিছু ভেবে আসোনি কোথায় নিয়ে যাবে?' নবনীতার গলায় এতোটুকু কুণ্ঠা নেই।

'তুমি এরি মধ্যে তৈরি?'

'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত।'

'এই পোশাকে? চুল পর্যন্ত বাঁধোনি।'

'পোশাক, এতোদিন আমার পোশাক দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলে নাকি?'

'তবু—'

'আমার পোশাক তো আর নিশ্চয়ই চাও না। আমার খোলা চুলেই তো রাত্রির পুঞ্জিত রহস্য রয়েছে শুনতাম।' অপর্যাপ্ত বিস্রস্তিতে নবনীতা বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ালো : 'এমনিতেই আমি সুন্দর নই?'

'অপরূপ।'

'কিন্তু কল্পনায় নভোবিহার করবার আর সময় নেই। এখন কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে ঠিক করেছ?'

প্রশ্নটা যেন বড়ো বেশি রূঢ়, প্রত্যক্ষ। নির্লজ্জ প্রখরতায় নিশীথের চোখ গেলো ধাঁধিয়ে। করুণ, ম্লান মুখে বললে, 'তুমিই বলো না ভেবে।'

'আমি ভেবে বলবো?' দেয়ালের দেশে সমস্ত হাসি নিঃশব্দ পাথর হয়ে গেছে, নইলে তরল জলস্রোতের মতো নবনীতা হেসে উঠতো অনর্গল। আস্তে-আস্তে সে তার চেয়ারে গিয়ে বসলো। সমস্ত শরীরে উদাস একটি নির্লিপ্ততা আনলে। টেবিলের উপর হাত রেখে তাতে সে মাথা নামিয়ে আনলে, বললে, 'দাঁড়াও, ভেবে দেখি। আরেক দিন এসো।'

অনেক বেশি সে আশা করে ফেলেছিলো বোধহয়। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি—যেন উত্তরঙ্গ সমুদ্রের স্বরে কে তাকে ডাক দিয়েছিলো অকস্মাৎ। যেন কতোগুলি ঢেউ তার উপর ভেঙে পড়েছিলো, নগ্ন শুভ্র বিহ্বল কতোগুলি ফেনা। মনে হয়েছিলো এই বুঝি সে ডুবে গেলো, মাটির পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে, অনির্ণীত অতলতায়। বুঝি মৃত্যু তাকে লুট করে নিয়ে যেতে এসেছে, লজ্জার শেষ তন্তুটুকু পর্যন্ত ছিঁড়ে দিয়ে। বুঝি সে আর সে রইলো না। দেয়ালের ফাটলে বোধহয় অঙ্কুর গজালো। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে জেগে উঠলো বা চাঁদের কণিকা। পুরোনো, পচা পাতা ঝরিয়ে ঝড় এলো বা দুর্দান্ত স্নেহ নিয়ে।

আশা একটা অসুস্থতা, বড়ো বেশি সে আশা করে বসেছিলো।

পাশা না ঢালতেই উঠেছিলো সে আনন্দে আর্তনাদ করে। এখন নিশীথের জন্যে, বিশেষ করে তার এই পরাভূত মৌনতায় তার জন্যে নবনীর গভীর মায়া করতে লাগলো। ইচ্ছে হলো, পাশে বসিয়ে তাকে একটু আদর করে, কপালের ঘাম মুছে দেয়, তার মোটা-দাঁড়া চিরুনি দিয়ে চুলটা দেয় একটু আঁচড়ে, সার্টের গলার বোতামটা নিয়ে একটু খেলা করে। যাতে নিশীথ খুশি হয়, যাতে সে খুঁজে পায় তার অভ্যস্ত পরিমিতি। এতটা উদ্ঘাটন সে সইবে কি করে, কাচের গ্লাশে করে ঠাণ্ডা জল ছাড়া যে আর কিছু চাইতে পারে না? বেচারা! মুহূর্তের চাকার তলায় নবনীর বুকটা ভেঙে যেতে লাগলো। এতটা রাস্তা সে কি করে না-জানি যাবে? তার চেয়ে তাকে যদি সে এ-ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারতো! এর বেশি নিশীথ কখনো চায় না, যদি শুধু সে ঘুমুতে পারতো একবার নবনীর নরম নিভৃতিতে! ঘুম, অকপট ঘুম, শরীর থেকে নিঃশেষ মুছে যাওয়া। নবনী জানলা বন্ধ করে দিতো, যাতে কালকের ভোরের রোদ না তার চোখে এসে লাগে—কেননা আগামী দিনের স্পষ্টতা তার কাছে একটা অকারণ অত্যাচার।

'এখনো খেতে যাসনি যে নবনী?'

বলে দিতে হবে না, এটা যোগীনবাবুর গলা।

ঘরের উত্তপ্ত নিঃশব্দতার উপর কে যেন একটা ভিজে কম্বল ছুঁড়ে দিলো।

'এ কি, তুমি? এত রাত্রে?' নিশীথকে তিনি একটা ভূতের মতো দেখলেন।

'হ্যাঁ, রাত এখন খানিক হয়েছে বটে।' নিশীথ গলায় একটুও হোঁচট খেলো না।

যোগীনবাবু একবার এ-দিকে অন্যবার ও-দিকে তাকালেন। ঝাঁজালো গলায় বললেন, 'তোমাকে এ-বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছি না?'

'দিয়েছেন।'

'তবে আসো যে?'

'বারণ করবার কোনো মানে হয় না বলে।'

শুকনো ঘাসে আগুনের মতো যোগীনবাবু দাউ-দাউ করে উঠলেন : 'এটা আমার বাড়ি তা জানো?'

'জানি।'

'তবে?'

'আপনার কাছে আমি আসি না।'

'তোমাকে এ-বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারি জানো?'

'যে-দিনই আসি, সেদিনই তো আবার বেরিয়ে যাই। কোনোদিনই তো শেষ পর্যন্ত থাকি না। মিছিমিছি তবে আর কেন কষ্ট করতে যাবেন?'

'তোমার নামে ট্রেসপাশের মামলা চলে, তা খেয়াল রাখো?'

'মামলা আনলে তো বেঁচে যাই।' নিশীথ গলাটা একটু তরল করলে।

'তার মানে?'

'তার মানে, এত দিন কবিতা করে মাসিক-পত্রিকায় যা বলছিলুম, এবার তা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সহজ গদ্য করে বলতে পারবো।'

'তোমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে মার খাওয়াতে পারি জানো?' যোগীনবাবু টগবগ করে উঠলেন।

'আপনি একলাই পারেন। ওদের মিছিমিছি আর লাগাতে যাবেন কেন?'

'তুমি যাও, তুমি যাও এক্ষুনি আমার বাড়ি ছেড়ে।'

'সেটা না বললেও চলতো।' নিশীথ সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো : 'এখানে যে পাত পেতে রাখেননি সেটা জানা আছে। নইলে, এত দিন আসা-যাওয়া করছি, এক দিনও তো এক-প্লেট জল-খাবার খেতে দিলেন না। খালি এই মার তো সেই মার!'

'তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে—এততেও তোমার লজ্জা হয় না? তবু তুমি আস?'

'আপনি তো ভদ্রলোকের বাপ—আপনারই বা এত দিনে লজ্জা হলো কোথায়? তবু, তবু যখন আমি আসি!' নিশীথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে একবার ফিরে দাঁড়ালো : 'আর উতলা হবেন না, খোলা দরজাটা এবার আমার নির্ভুল চোখে পড়ছে।' তারপর ক্ষীণ একটু হেসে : 'আশা করি আপনার এই ভোঁতা বীরত্ব অন্যত্র আর এখন প্রয়োগ করবেন না। আচ্ছা, নমস্কার। পুনরাগমনায় চ।'

নিশীথ অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কথা, নিষ্ফল শুধু এই কথার আস্ফালন। ঘামে ও ঘৃণায় নবনীতা গলে যেতে লাগলো। যতো তেজ এই তার অসার মৌখিকতায়। কিন্তু কাজের বেলায় সামান্য কড়ে আঙুলটিও তার উঠবে না দেখো। কেবল পলকা কতোগুলি কথার ফুলকি, রঙিন ফুলঝুরি। নইলে, এসেছিলো তো তাকে নিয়ে যেতে, সোজা হাত সে বাড়িয়ে দিতে পারলো কই, প্রতিজ্ঞা-প্রখর, পরুষ-প্রবল হাত! ছিঁড়ে ছিনিয়ে সে নিতে না পারতো, ছল করতে বা তাকে বারণ করেছিলো কে? যুদ্ধে বা প্রেমে অন্যায় বলে তো কিছু নেই। যুদ্ধ-জয় নিয়েই তো তার কথা! নবনীতা অসহায় ঘৃণায় দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো : নিশীথ তাকে কখনো চায়নি, চেয়েছে শুধু তার এই পোশাকটাকে। রহস্য-ধূসর যবনিকা, যেটাতে তাকে শুধু কবিতার ধ্যানমূর্তি বলে মনে হয়েছে।

'নবনী।' যোগীনবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'এই যাই খেতে, কাকাবাবু।' নবনী সহজ, স্মিত মুখে নেমে গেলো।

[তিন]

দিন সাতেক পরে। নিশীথ এবার প্রচণ্ড দুপুর-বেলায় এসে হাজির। ভঙ্গিতে একটা যেন যুধ্যমান ঔদ্ধত্য নিয়ে এসেছে।

যোগীনবাবু নিচে তাঁর আপিসে বসে প্রেসের তদারকি করছিলেন,

আগন্তুককে দেখতে পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন : 'আরে, নিশীথ যে। এসো, এসো, কত দিন পর।'

এতটা সমাদর নিশীথ সশরীরে কখনো আশা করতে পারতো না। ঘাবড়ে গেলো নিতান্ত, হতভম্বের মতো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো এক পাশে।

যোগীনবাবু ফের ডাকলেন : 'ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলে এসো ভেতরে।'

নিশীথ সাত-পাঁচ কিছু বুঝতে না পেরে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

যোগীনবাবু একখানা চেয়ার দিলেন এগিয়ে : 'বোসো।' আর তক্ষুনি হাঁক পেড়ে ডেকে আনালেন চাকরকে। ড্রয়ার থেকে একটা আধুলি বের করে চাকরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'যা, আট আনার ভালো খাবার নিয়ে আয় চট করে।' তারপরে নিশীথের দিকে তাকিয়ে : 'সরবত খাবে, না, চা করতে বলবো?'

নিশীথ অস্থির হয়ে উঠলো। কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'দরকার নেই কিছু।'

'তা কি হয়? রোজ-রোজ আসো, এক প্লেট খাবার খেতে দিই না, সেটা কি একটা ভদ্রতা?' যোগীনবাবু দরাজ গলায় হেসে উঠলেন।

নিশীথ নির্জীবের মতো খানিকক্ষণ বসে রইলো। পরে অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি করে বললে, 'আচ্ছা, আমি ওপর থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'তা তো যাবেই, যাবেই তো ওপরে—ওপর যখন নিচে নেমে আসছে না।' যোগীনবাবু নিজের রসিকতাটা নিজেই আদ্যোপান্ত সম্ভোগ করলেন : 'তা, মিষ্টিমুখটা নিচেই না-হয় আগে করে গেলে।'

এতটা সম্বর্ধনা নিশীথের কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত, অসম্বৃত বোধ হচ্ছিলো। নবনীতার বাবা সেকালের ইস্কুল-মাস্টার ছিলেন, দ[illegible]র

বেড়া-দেয়া মাইনর ইস্কুলে এ'রা পুরোপুরি মানুষ—যোগীনবাবুরা আর-আর তিন ভাই। বড়ো-বড়ো হরফে সুনীতির একেকটি অতিকায় প্রাচীর-পত্র। নইলে, নিশীথের এ-বাড়িতে আসা-যাওয়াটা এ'রা বরদাস্ত করতে পারেন না এমন কোনো কারণে নয় যে পাত্র হিসেবে সে অযোগ্য বা জাতে-কুলে তার সঙ্গে ঘোরতর অমিল—একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, সে নবনীতাকে, তাদেরই ঘরের মেয়েকে কিনা 'ভালোবাসে'! ভালোবাসা, যার মানে হচ্ছে কিনা চিত্তের রক্তাতিসার, ইন্দ্রিয়ের কালাজ্বর, স্নায়ুর ধনুষ্টঙ্কার। প্রেম হচ্ছে চরিত্রহীনতারই ছদ্মবেশ; আর ভালোবেসে বিয়ে করাটা হচ্ছে অভিচার করে গঙ্গাস্নান করার মতো। এর জন্যেই কাকাদের আপত্তি—এই বয়েসে কোথায় সে কুস্তি করবে, বিবেকানন্দ পড়বে আর ফ্লাড্ বা ফ্যামিন-রিলিফে ভলাণ্টিয়ার হবে, তা নয়, খাচ্ছে সিগারেট, কামাচ্ছে গোঁফ, লিখছে কবিতা। এই বয়সে কাকারা ক্ষুর দিয়ে জুলপি পর্যন্ত কামাননি। কাপড়ের পাড়টা এক-ইঞ্চি না এক-চুল এ-সব দিকে লক্ষ্যই ছিলো না; লক্ষ্যই ছিলো না সেটা পায়ের পাতায় আছে না উঠে এসেছে হাঁটুর উপর। কাপড়টাই বা কোরা না ধোয়া তা কে খেয়াল রাখতো? মেয়ে বলে সংসারে যে একটা উপসর্গ আছে, যে-উপসর্গ বলপ্রয়োগ করে ধাতুকে এক অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিয়ে যায়, সেটা তাঁদের কাছে জ্যামিতিক কল্পনা ছিলো। মরবার আগে দাদার কী যে বুদ্ধিভ্রম হলো, বলে গেলেন, নবনীকে, তাঁর একমাত্র সন্তান নবনীতাকে যেন যতদূর সম্ভব লেখাপড়া শেখানো হয়, যতদূর সম্ভব মানে যত দিন না তার বিয়েটা ঘটে ওঠে। এরি জন্যে এবং এই সর্তে, সর্তটা অবিশ্যি অলিখিত, তাঁর সঞ্চিত অর্থ যোগীনবাবুর হাতে এসে পড়েছে। মেয়েও তেমনি খাঁচার দরজা আলগা পেয়ে বইয়ের আকাশে উন্মুক্ত উড়াল দিয়েছেন : এবার পরীক্ষার্থিণী মেয়েদের দশমিকার একজন হয়ে সে বৃত্তি পেয়েছে আই-এতে। সে যাই হোক, তাঁদের পাঁঠা তাঁরা ঘাড়ের দিকেই কাটুন বা ল্যাজের দিকেই কাটুন, ভোজের গন্ধ

পেয়ে বাইরের লোক মাথা গলাতে আসে কেন? তুই, জোয়ান ছেলে, কোথায় দাঁত দিয়ে লোহার রড্ বেঁকাবি, চুল দিয়ে চলন্ত মোটর ধরে রাখবি, তা নয়, কোথাকার কে একটা ভর-বয়সের মেয়ের উড়ন্ত আঁচলের পিছু চড়াই-উতরাই করছিস। এইখানেই কাকাদের আপত্তি, দেশের কাজ সে কিছু করছে না। বিনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখছে, তা-ও অর্থ তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝবার যো নেই। তাঁদের বাড়িতে ঢুকেছে একটা রুগ্ন, অশুচি হাওয়া। দিন-কে-দিন মেয়েটা যাচ্ছে শুকিয়ে, আজ নেই খিদে, কাল ধরেছে মাথা পর্শু চোখে দেখছে নাকি সর্ষে-ফুল! এমন লোককে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় না করে আর কী করা যায়! আর একবার যখন গোড়ায়ই তাকে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত সমানে বাধা না দিলে কোনো পৌরুষ থাকে না।

সেই যোগীনবাবু আজকে হঠাৎ এমন উত্তাল হয়ে উঠেছেন এটা একেবারেই স্বাভাবিক নয়। নিশীথ খানিকটা চিন্তিত বোধ করলে।

'খাবারটা ততোক্ষণে আসুক,' নিশীথ উঠবার দুর্বল চেষ্টা করলে: 'আমি ওপর থেকে একবার ঘুরে আসি।'

'কিন্তু, বেশিক্ষণ যেন দেরি কোরো না।' যোগীনবাবু অপাঙ্গে তাকে লক্ষ্য করলেন।

তিন লাফে সিঁড়িটাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে নিশীথ উপরে উঠে গেলো।

নবনীতার ঘর। নিষ্প্রভ, নিরুত্তর। দেয়ালে কোথাও একটা রেখা ফুটলো না। স্তূপীভূত একটা শূন্যতা।

টেবিলটা খালি, বইয়ের সবগুলি পৃষ্ঠা হঠাৎ বুজে গেছে। কড়ি-কাঠের তলায় যে চড়ুই-দুটোর বাসা তারা মনের আনন্দে টেবিলের উপর বালির গুঁড়ো ফেলে রেখেছে অগুনতি। চেয়ারটাতে অনেক দিন কেউ বসেনি। দেয়ালের টানা আয়নাটা কাপড় দিয়ে বাঁধা। কুলুঙ্গিতে যেখানটাতে তার ফিতে আর চুলের কাঁটা থাকতো, সেখানে সামান্য একটা

খবরের কাগজও আর পাতা নেই। এখানে-সেখানে বার কয়েক সে উঁকিঝুঁকি মারলো, কিন্তু আঁচলের শিথিল একটুও খসখসানি কোথাও শোনা গেলো না। ব্যাপার কী? আজ প্রত্যক্ষ শনিবার, এমনিতেই কলেজ নেই নবনীতার, তায় তিন দিন পর পুজোর ছুটি শুরু, এখুনি বেটাইম এক্‌স্‌ট্রা ক্লাশ খোলবার কথা নয়—গেলো কোথায়? দরজার বাইরে রাস্তাটা একমাত্র তার কলেজে গিয়ে পৌঁচেছে, আশে-পাশে বেড়াতে যাবার অলি-গলি তার অনেক দিন থেকেই বন্ধ, আর বেড়াতেই যদি যাবে, তবে বাড়ি ফিরে এসে আয়নায় আর তার মুখ দেখতে হবে না নাকি? বাথরুমের দরজাটা পর্যন্ত খোলা। আর-আর দিন পারিবারিক কোনো প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তাকে বাইরে বেরুতে হলে নিশীথের জন্যে দেয়ালের আনাচে কিম্বা কানাচে পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ত সংকেত রেখে যেতো, আজ নখের সামান্য একটা আঁচড়ও তার চোখে পড়ছে না।

অবশেষে ভরা রোদে নিশীথ ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ধরলে।

বুড়ি ঠাকুমা ছায়া-ঢাকা বারান্দার এক কোণে বসে ডালায় করে খই বাছছিলেন, মুখ তুলে শুধোলেন : 'কাকে আর অমন গরু-খোঁজা করছ? সে নেই।'

'নেই?' নিশীথের হৃৎপিণ্ডটা পায়ের তলায় খসে পড়লো।

ঠাকুমা তাড়াতাড়ি শোধরালেন : 'দিনাজপুর চলে গেছে।'

'দিনাজপুর? কবে?'

'এই তো পর্শু কি তার আগের দিন।'

'দিনাজপুরে কে আছে?'

'বা, ফকির আছে না?'

ফকির নবনীতার ছোটকাকা। দেশের নামে গোঁয়ারতুমি করবার পাকা ওস্তাদ। বিয়ে করেনি, কাঠখোট্টা।

'সেখানে গেলো কেন জানেন?'

'আর কেন! মেয়ের খেয়াল। এখানে নাকি তার পড়া হচ্ছে না।'

'কার সঙ্গে গেলো?'

'যোগীনের কে-এক ভায়রার সঙ্গে। সপরিবারে নাকি সেদিন ওদিক পানে যাচ্ছিলো। ফকির ইস্টিশানে এসে নিয়ে যাবে এই বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'কবে ফিরবে?'

'কিছু ঠিক নেই। যোগীন বলতে পারে।'

চার দিকে আরেকবার শূন্য চোখ বুলিয়ে নিশীথ নিচে নেমে গেলো।

'তোমার খাবার এসেছে, নিশীথ।' ঘরের মধ্যে থেকে যোগীনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

ঘরে ঢুকতে নিশীথ দ্বিধা করলো না। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বললে, 'নবনীতা বুঝি দিনাজপুরে চলে গেছে?'

'আশ্চর্য, আসল কথাটাই বলতে তোমাকে ভুলে গিয়েছিলুম দেখছি।' যোগীনবাবু মুখে-চোখে একটু বিনীত ভাব করলেন : 'খবরটা যা-হোক পৌঁচেছে তোমাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে একটা তার চিঠি লেখা উচিত ছিলো।'

'চিঠি লিখতে হলেই তো পুরু লেফাফায়, কতোগুলি পয়সা বেরিয়ে যায়। তুমি তো এ-পাড়ায় আসবেই একদিন জানে, রোদই উঠুক আর বৃষ্টিই পড়ুক—এলেই তো খবরটা তোমার কাছে আর চাপা থাকবে না। তাই কষ্ট করে আর লেখেনি আর কী!'

'কিন্তু সেখানে ও কেন গেলো বলতে পারেন?'

'ও যায়নি। আমিই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'কারণ?'

'আজ প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে তুমি এ-বাড়ির চৌকাঠ মাড়াচ্ছ, তোমাকে বলতে আর আপত্তি কী!' যোগীনবাবু ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন, 'এ-বাড়িতে ওর একদম পড়া হচ্ছে না। ফিলজফিতে অনার্স নিয়েছে তো জানো, সে তো আর চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু দুদণ্ড নিরিবিলি

বসে পড়ে কোথায়? কেবল গোলমাল, মিনিটে-মিনিটে ডিস্ট্র্যাকশান।'

'গোলমাল! এ-বাড়িতে গোলমাল কোথায়?'

'আর বোলো না। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল বাজে লোকের আনাগোনা। বসে-শুয়ে কেবল গুজগাজ, ফাটুরফুটুর। যতো সব ব্যাড্ ইনফ্লুয়েন্স্, বুঝলে না, এথিক্স্ ছেড়ে এখন কেবল কবিতার পাদপূরণ হচ্ছে।' যোগীনবাবু নিবিড় অন্তরঙ্গতার ভান করলেন : 'এই বিশ্রী আবহাওয়ায় পড়ায় কখনো মানুষের মন বসে?'

নিশীথ চমকে উঠলো : 'আমি ছাড়া আরো কেউ আসে নাকি এ-বাড়ি?'

'রক্ষে করো।' যোগীনবাবু কুটিল করে হাসলেন : 'তুমি তো একাই একশো।'

'যাক, আস্বস্ত হলাম।' নিশীথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : 'তবে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করবাব জন্যেই ওকে দূরে সরিয়েছেন?' নিশীথ যেন মনে-মনে হাসলো।

'তবে তুমি আজই আবার দিনাজপুরে ছুটবে ভেবেছ নাকি?'

'পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।'

'কিন্তু যাবার আগে খাবারটা খেয়ে নিলে পারতে। তোমার গাড়ি তো সেই রাত্রে।'

'আপনার আট আনা যে খসেছে সেই যথেষ্ট। আপশোষ করবেন না।' নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'ফিরে এসেই খাবো।'

যোগীনবাবু খাবারের থালাটা বয়ে যেতে দিলেন না নিঃশব্দে।

[চার]

চেয়ে-চিন্তে কিছু টাকা সে সংগ্রহ করলে। আর ভোর হতে-না-হতেই পর দিন দিনাজপুর।

ফকিরের আর যা-ই না থাক, প্রসিদ্ধি আছে। গাড়োয়ান বাড়ি চিনলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফকির তখন নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলো, নিশীথকে দেখে একেবারে অবাক।

'আপনার এখানে আজ অতিথি হলাম।'

'স্বচ্ছন্দে।' ফকির বললে : 'এটা আমাদের কেন্দ্রীয় আপিস, চাই না-চাই অনেক রকম লোকই এসে এখানে দুবেলা ঢুঁ মারছে, তোমার তো অন্তত মুখ চেনা।'

'আবার প্রথম ফিরতি-ট্রেনেই চলে যাবো।'

'তা যাবে, কিন্তু সক্কালবেলা কী মনে করে হঠাৎ? সম্প্রতি সি-আই-ডিতে ঢুকেছ নাকি?'

'প্রায়।' নিশীথ হাসলো।

'ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলো না, দিক-বিদিক একটু ভেবে দেখি।'

'আর কিছু নয়,' নিশীথ আমতা-আমতা করে বললে, 'নবনীকে একবার ডেকে দিন।'

'নবনী?' ফকির আকাশ থেকে পড়লো : 'সে এখানে এলো কবে?'

'আজ তিন-চার দিন হলো এসেছে।'

'তুমি এতোটা পথ স্বপ্নে হেঁটে এসেছ নাকি?' ফকির তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলে।

'দেখুন, আমাকে আর যন্ত্রণা দেবেন না,' নিশীথের গলা কেঁপে উঠলো হয়তো : 'সামনে গিয়ে কথা বলতে না দিন, দূর থেকে সামান্য একবার চোখের দেখা—'

'কি মুশকিল! সে এখানে থাকলে তো তার সঙ্গে কথা কইবে! আর শুধু কথা বলাই বা কেন? দুটিতে থাকো না কেন মিলে-মিশে যতোদিন খুশি—বাড়তি ঘর তো মেলাই পড়ে আছে এখানে। আমার আপত্তি

করবার কী মাথা-ব্যথা পড়েছে শুনি! দেশের কি আর সে-অবস্থা আছে ভাই? আমরা নিজেরা যারা স্বাধীনতা খুঁজছি, পরের স্বাধীনতায় আমরা হাত দিতে যাই কি করে?'

'তা হলে নবনী এখানে আসেনি বলছেন?'

'এ তো দেখছি ঘোরতর বিপদে পড়লাম। নবনী বলে যাকে-তাকে দেখিয়ে দিলে যদি তোমার চলে, চেষ্টা করে দেখি!' ফকির হেসে উঠলো : 'আচ্ছা, বেশ, সে এখানে থাকলে, এখানেই তো আছে, নাম ধরে ডাকো না তাকে চেঁচিয়ে।'

নিশীথের গলার স্বর ফুটলো না।

'সঙ্গোপনে সম্ভাষণ করবার সুযোগ না হয়, একবার চেঁচিয়েই আত্ম-নিবেদন করে যাও না।' ফকির তার কাঁধে মৃদু-মৃদু টোকা দিতে লাগলো : 'আরে, এটা হচ্ছে সন্নেসির আস্তানা, দিবা-রাত্রি এখানে ভূতের নৃত্য চলেছে, এখানে আসবে কেন নবনী? তুমি যেমন একটি আস্ত পাগল, চিঠিতে একবারও খোঁজ না নিয়ে হন্তদন্ত ছুটে এসেছ! এততেও তোমার বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা যাও, বাড়ির ভিতরটা তুমি নিজের চোখেই দেখে এসো একবার।' নিশীথকে সে ঠেলে দিলো।

হ্যাঁ, তন্ন-তন্ন করে সে দেখে নেবে। কাউকেই বিশ্বাস নেই।

কিন্তু প্রথম ঘরে ঢুকতেই, দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে, শাড়ির চঞ্চল একটি আভাস পাওয়া গেলো। নিশীথের সমস্ত শরীর প্রজাপতির পাখার মতো হালকা হয়ে এলো—যেন অনেকখানি আকাশ সে ঘুমের মধ্যে দিয়ে উড়ে এসেছে।

কিন্তু চঞ্চল শাড়ির রঙিন পাড় অদৃশ্য হয়ে গেলো আচমকা।

নিশীথ থেমে পড়ে বললে, 'এ কি? আমি।'

শাড়িতে একটিও কিন্তু রেখা ফুটলো না।

ঘরের মধ্যে নিশীথ ঢুকে পড়লো সাহস করে। শুধু নবনীতাকে আপাদমস্তক একবার চমকে দেয়া, শুধু তার উপস্থিতিতে একবার

ঘোষণা করে দিয়ে আসা যে এত সহজে তাকে সে ছুটি নিতে দেবে না।

'আমাকে দেখে পালাচ্ছ যে আজকাল!'

কিন্তু এ কী সর্বনাশ! শাড়ি দিয়ে যে হঠাৎ একটি অবগুণ্ঠন রচনা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ নবনী নয়। কুণ্ঠিত বাহুর ডৌলটিতেই তা বোঝা গেছে। এ তবে কে এখানে, ফকিরের শ্মশানে? সদ্য ঘুম থেকে উঠে এরি মধ্যে এ-বাড়ি বেড়াতে এসেছে চেহারায় এমন কিছু মনে হলো না। নিশীথ নিমেষে লজ্জায় শুকিয়ে গেলো। পালাতে সে পথ পেলো না।

'কী, পেলে নবনীকে?'

'না। কিন্তু ঘরের মধ্যে উনি কে জানতে পারি?'

'দেশ-সেবিকা।' ফকির গম্ভীর মুখে বললে।

'আপনি বিয়ে করলেন কবে?' নিশীথ বোকার মতো জিগগেস করলে।

'বিয়েটা এখনো ঠিক ঘটে ওঠেনি। কিছু টাকার দরকার। ওঁর একটা চাকরি হলেই হয়ে ওঠে।'

'চাকরি মানে?'

'খেতে হবে তো? আর আমার দ্বারা কিছুই তো বিশেষ সম্ভব হবে না জানো। এতোটা বয়েস কেবল গুণ্ডামি করেছি। ওঁর বরং ইতিমধ্যে ট্রেনিংটা পাশ ছিলো। এখানে ইদানি একটা চাকরির সম্ভাবনা হয়েছে, তাই ধরে রেখেছি ওঁকে। একটা চাকরি-বাকরির সন্ধান না হলে পাকা-পাকি গেরস্থালিতে ঠিক মন দিতে পাচ্ছি না।'

'শেষকালে উনি চাকরি করবেন?'

'কেনই বা করবেন না? ওঁরো তো সমান দায়িত্ব। ভালোবাসাটা তো আমার একার নয়।'

'আর আপনি?'

'স্বর্গ-মর্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু জানোই তো, চিরদিন কেবল নেতার পেছনে থেকে বাধ্য ছেলের মতো ভার বয়ে বেড়িয়েছি, কোনোদিন চাঁদার থলিটাতে ভাগ বসাতে পারিনি।'

'তা হলে আপনি দেশের কাজ-টাজ সব ছেড়ে দিয়েছেন বলুন?'

'যদি দেশের কাজ সেটাকে বলো! আমি প্রচুর, পরিপূর্ণ করে বাঁচবো, তবেই তো দেশ আমার মধ্যে বাঁচবে। আমার মধ্যে যদি প্রেম না থাকে, তবে দেশপ্রেম থাকবে কি করে?'

'আপনার বাড়ির লোক, দাদারা এটা জানেন?'

'গ্রাহ্য করি না।'

'জানলে ওঁরা তুমুল আপত্তি তুলবেন নিশ্চয়।'

'কে কান দেয়? চিরদিন নিজের মাপে, নিজের তাগিদে বেঁচে এসেছি, কারু শাসনে এক ইঞ্চি বেঁটে হইনি, নিশীথ। যতো বাধা, ততোই তো বাঁচবার সুখ।' ফকির তার তন্ময়তা থেকে হঠাৎ উঠে এলো : 'আশ্চর্য, আমি নিজের কথাই বলে যাচ্ছি এক নাগাড়ে। তারপর, তোমার খবর কী বলো?'

নিশীথও বুঝি এতোক্ষণ ভুলে ছিলো নিজেকে। সহসা সজাগ হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা খুলে বললে।

'বুঝেছি, মেজদা তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।' ফকির স্নিগ্ধ, নরম গলায় বললে, 'তোমার স্বভাবটা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছিলো, ভেবেছিলো দিনাজপুরের দিকে তুমি ঠিক ধাওয়া করবে, তাই তোমাকে একটা ভুল নাম দিয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমাকে প্রায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন।'

'কী অন্যায় কথা! এখন কী করবে?'

'ভাবছি।' নিশীথ নিরাশ মুখে বললে।

'তুমি তার জন্যে দমে গেলে নাকি? এসেছ যে, এই যথেষ্ট। দেখা না-ই বা পেলে। অনেকে তো একেবারেই দেখা পায় না।' ফকির তার হাত ধরে টান মারলে : 'এসো, বাড়ির ভিতর। হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাও।'

'না, আমি এখন যাবো।'

'পাগল হয়েছ নাকি—এখন যাবে কোথায়? আজকের দিনটা এখানে, আমার বাড়িতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম করো। পাছে মনে লেশমাত্র সন্দেহ থাকে আমিও দাদার মতো তোমার চোখে ধুলো দিলুম!'

'আপনি যে আজকাল অতিমাত্রায় উদার হয়ে উঠেছেন।'

'পৃথিবীকে দেখবার দৃষ্টি-কোণটা যে নিমেষে বদলে গেলো ভাই। আমি যে আর সে নেই।' ফকির তাকে সবেগে আকর্ষণ করলো : 'চলে এসো। দেখবেখন আমার কয়েদের চাঁদ।'

'উনি আমাকে দেখে বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'পাবেন না? চিরকাল আত্মীয়-বন্ধু আর সমাজ-হিতৈষী। এক মুহূর্ত তিষ্ঠোতে দিলে কই? এসো, আর ভয় নেই, আমি যখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'কিম্বা সে আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।' নিশীথ আস্তে-আস্তে বললে।

[পাঁচ]

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিশীথ যেতে পারতো, কিন্তু দিনাজপুর থেকে যোগবাণী পর্যন্ত যে-লাইন, তাতে পূর্ণিয়ার কয়েক স্টেশন উত্তরে অনতিখ্যাত এক শহরে তার মাসিমা থাকেন সে-কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো। কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে, আর পুজোর ছুটিটাও যখন দরজার গোড়ায়। মাসিমা কত খুশি হবেন।

পূর্ণিয়ায় গাড়ি এসে দাঁড়ালো, বেলা তখন প্রায় সাড়ে-দশটা। গাড়ি খানিকক্ষণ থামে। নিশীথ প্ল্যাটফর্মে নামলো খানিকটা পাইচারি করতে।

হঠাৎ পিছন থেকে তার গর্দানটা কে সজোরে চেপে ধরেছে।

নিশীথ আঁতকে উঠলো। তাকিয়েই চমকে চিনতে পারলো, ভূপতি, তার বি-এ ক্লাশের বন্ধু। শুনেছিলো, এখানে তাদের বাড়ি, কিন্তু

এমন জায়গায় সহসা তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

'কোথায় যাচ্ছিস?' উজ্জ্বল মুখে ভূপতি জিগগেস করলে।

'মাসিমার ওখানে।'

'বলিস কি যা-তা? খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, মাসিমার ওখানে! আপাতত চলে আয় আমাদের বাড়িতে। কতোদিন পর দেখা বল্ দিকি?'

'কিন্তু—'

'মাসিমাকে নিশ্চয়ই চিঠি দিয়ে যাচ্ছিস না?'

'না, হঠাৎ খেয়াল হল বেরিয়ে পড়লাম।'

'বেশ করেছিস। তোর মাল-পত্র কোথায়? সঙ্গে কিছু আনিসনি নাকি?'

'না।' নিশীথ হাসিমুখে বললে, 'নিজেকেই প্রায় বহন করতে পারি না এত ভার।'

'এ কি, সন্নেসি হয়ে বেরিয়েছিস নাকি?'

'প্রায়।'

'চল্, দুদিনেই তোর বৈরাগ্যের পিত্তি চটকে দিই।' ভূপতি তাকে তার মোটরে নিয়ে এলো : 'আপাতত আমার তাশের তো মনের মতো খেড়ি জুটলো। পরে শিকারে বেরুনো যাবে। নেপাল-বর্ডারটাও ঘুরে আসবো মোটরে। দলবল মন্দ নেই।'

মন্দ হবে না। ক'টা দিন হালকা হাসির ঝাপটায় ছড়িয়ে, উড়িয়ে দেয়া যাবে।

স্টেশন থেকে অনেকটা ফাঁকা রাস্তা পেরিয়ে তবে খাঁটি শহর। ভূপতিই ড্রাইভ করছিলো, নিশীথ বসে পাশে। হারানো দিনের অনেক সব খুঁটি-নাটি খবর।

অনেক দূরে চলে এসেছে, পাশের একটা বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে কে হঠাৎ সানন্দস্ফুট, বিস্মিত গলায় উছলে উঠলো : 'এই যে।'

দু’ বন্ধুই চোখ তুলে তাকালো উপরের দিকে।

উপন্যাসেও পড়া যায় না, এমন অভাবনীয়। ভূপতি অবিশ্যি সেটাকে বিশেষ লক্ষ্যে আনেনি, কেননা গাড়ি চালিয়েছে সে সমানে। কিন্তু নিশীথ স্পষ্ট দেখলো, ব্যালকনিতে নবনী, নবনীতা। শাড়ির পাড়টি পর্যন্ত হুবহু।

তার সমস্ত শরীরে রক্তের সমুদ্র হঠাৎ উত্তাল দুলে উঠেছে। ‘এখান থেকে তোদের বাড়ি আর কতোদূর?’ নিশীথ দ্রুত জিগগেস করলে।

‘বেশি নয়।’

নিশীথ সমস্তটা রাস্তা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মুখস্ত করতে লাগলো। এই ল্যাম্প-পোস্ট বাঁয়ে, লাল রঙের বাড়িটা এই ডাইনে রেখে উজোন যেতে হবে, আর কিছু না হোক মনে থাকবে ঐ দেয়ালের গায়ে ওষুধের বিজ্ঞাপনটা।

‘ও-বাড়িটা কার রে, ভূপতি?’

‘নজরে পড়েছে তো ঠিকঠাক?’ ভূপতি তাকে বাঁ কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা ঠেলা মারলে: ‘সন্নেসি হবার চমৎকার নমুনা দেখছি যে। সিদ্ধ হলে মদনানন্দ উপাধি দেয়া যাবে।’

‘ও-বাড়িটা কার তাই বল না?’

‘মন্দ নয়, কী বলিস? মাত্র কদিন হলো কলকাতা থেকে এসেছে, এরি মধ্যেই সমস্ত শহর জ্বলজ্বলাট। তবু যা শুধু ঐ বারান্দাটুকুতে বেরোয়, রোদ না থাকলে হাতে বই নিয়ে, রোদ থাকলে বা হয়তো পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে।’

‘কিন্তু কে ও?’

‘জগৎবাবুর শালী।’

জগৎবাবু! নামটা মনে রাখতে হবে। নাম সম্বন্ধে তার স্মৃতি বড়ো কৃপণ। জগদ্দল পাথর, জগা নামে তাদের এক চাকর ছিলো, নিদেন পক্ষে জগুবাবুর বাজার।

'কে জগৎবাবু ?'

'উকিল।'

'লোকজন কেউ চেনে-টেনে ?'

'বা, চেনে না ? বাঙালীর মধ্যে রোরিং প্র্যাকটিস এখানে। দেখলি না কেমন জমকালো বাড়ি ফেঁদেছে ! এ কি বাবা ভুঁইফোঁড়ের কর্ম ?'

যাক, আশ্বস্ত হওয়া গেলো। চিনলেই হলো ভদ্রলোককে। যদি বা নেহাত রাস্তাটা কখনো তার গোলমাল হয়ে যায়। নতুন লোক।

'কী বাবা, উঠে-পড়ে এত খোঁজ নেয়া হচ্ছে কেন ?' ভূপতি ফোড়ন দিয়ে বললে, 'মীনকেতনের বন্দনার আগেই একেবারে প্রজাপতি ?'

'আদার ব্যাপারী হলে কি হবে, জাহাজ দেখলেই মনটা কেমন ভেসে পড়তে চায়।'

'আরে ভাই, বেল পাকলে কাকের কি ?'—

ভূপতিদের বাড়িতে নৈবেদ্যের চূড়াটা প্রায় অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। দুঘণ্টাতেই নিশীথ দস্তুরমতো অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। কতো-ক্ষণে, কেমন করে না-জানি সে পালাতে পারবে ! এরা সমস্তক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে। ভদ্রতা বাঁচিয়ে বেরোতে হলে সেই সন্ধে, তা-ও সদলবলে। এতক্ষণ সময়ের এত ভার নিশীথ বইবে কি করে ? কেন যে মরতে তার ভূপতির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ইস্টিশানে !

ভূরিভোজনের পর চাকর একেবারে তাওয়াদার তামাক দিয়ে গেলো। ভূপতি বললে, 'আলবোলা মুখে দিয়ে এবারে তাশে বসা যাক হে, নিশীথ। তুমি আমার পুরোনো পার্টনার।'

নিশীথ মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'ট্রেনের ধকলে শরীরটা বিশেষ জুত লাগছে না ভাই। একটু ঘুমুতে পেলে ভারি ভালো হতো।'

'তা তো ঠিকই।' অনেকেই সায় দিলে।

'কিন্তু একঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পারবে না বলে দিচ্ছি।' ভূপতি বললে, 'নাকে নস্যি ঢুকিয়ে ঘুম ভাঙাবো।'

'যা তোমাদের হল্লা, বিশেষ পরিশ্রম করতে হবে না। যদি কোথাও একখানা নিরিবিলি ঘর পাওয়া যেতো!'

'সে আবার এমন কি বেশি কথা!'

নিচেই একটেরে ছোট একখানি ঘর পাওয়া গেলো, এদের বহু-বিচিত্র কলহ-কোলাহলের একটু দূরে, অখণ্ড নির্জনতায়। পুরু গদির উপর ফাঁপানো বিছানা। নিশীথ গা ঢেলে দিলো শিথিল।

জেগে থেকে ব্যাপারটা সে যেন আয়ত্ত করতে পারছে না। যেন জ্বলন্ত রৌদ্রে তারাখচিত শিশির-রাত্রির সে স্বপ্ন দেখছে। গলার স্বরে যেন বসন্তের সুরভিত উচ্ছ্বাস, অপস্রিয়মাণ আঁচলে দিগন্তের ধূসরিমা, সমস্তটি আবির্ভাব তার দৈবত, রজত গিরিচূড়ার মতো।

নিশীথের শুধু ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

[ছয়]

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। ওদিকে খেলায় যখন ওরা মেতে আছে, তখন এক ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে।

ঈশ্বর যদি দয়া করেন, তবে কী না হয়? নিশীথ পায়ের তলায় সোজা রাস্তা খুঁজে পেলো। পিছনে তাকাবার আর ফুরসত নেই, সমস্ত রাস্তা তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, হাওয়া বইছে অনুকূল, সটান সে সেই জগৎ-বাবুর দরজায়। কড়া নাড়তেই, আর কেউ নয়, নিজ হাতে দরজা খুলে দিলো নবনীতা। মাটির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

'এ কী, তুমি এখানে কি করে?' নবনীতার মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি নিজেও কিছু ভাবতে পারছি না, কি করে যে এলাম।' নিশীথ নবনীতার হাত চেপে ধরলো : 'সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রে কোথায় কি যেন একটা জটিল ষড়যন্ত্র আছে, নবনী।'

'ভেতরে এসো।' নবনীতা তাকে মৃদু আকর্ষণ করলো : 'এমনি এখানে বেড়াতে এসেছিলে বুঝি?'

'পাগল, তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি!' নিশীথ ঘরের মধ্যে চলে এলো।

জগৎবাবুর বৈঠকখানা। সম্ভ্রান্ত উকিলের যা হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, নির্দিষ্ট ধাঁচের রাশি-রাশি ঝকঝকে বইয়ে বিশালকায় আলমারির সারি আর গদি-মোড়া চেয়ারের আবর্জনা সরিয়ে দুজনে দুখানা অখ্যাত চেয়ারে গিয়ে বসলো, মুখোমুখি। জানলাগুলো বন্ধ, সমস্ত ঘরে কৃত্রিম, রমণীয় একটি ছায়া-করা। পবিত্র একটা স্তব্ধতা রয়েছে ঘুমিয়ে।

'তুমি তো আমাকে কেবল অনুসন্ধানই করছ,' নবনী করুণ করে হাসলো : 'কিন্তু এ-পর্যন্ত আবিষ্কার আর করতে পারলে না।'

'বলো কী, আমার দুই চক্ষু অন্ধ করে তোমাকে আড়াল করতে চেয়েছিলো,' নিশীথ দুই চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো : 'কিন্তু পারলো না, পথ চিনে ঠিক তোমাকে ফের ধরে ফেললুম। চোখ ভরে তাই দেখতে দাও তোমাকে, আকাশের শান্ত নীলিমার মতো।'

'কতোই তো দেখলে!' মৃদু ঠাট্টায় নবনীতার নিচের ঠোঁটটা একটু কাঁপলো।

'কিন্তু এ হচ্ছে অন্ধের দেখা। তুমি তো আর জানো না, কি করে এসেছি।'

'অন্ধেরই দেখা বটে!' নবনীতা হাসলো : 'আশ্চর্য, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার কিন্তু ঠিক মনে হয়েছিলো, তুমি আসবে, না-এসে পারোই না কিছুতেই। হ্যাঁ, কি করে এলে বলো শুনি? বলবো কি, ঠিক একটা উপন্যাসের মতো লাগছে, নয়?'

'সত্য এমনিই রোমাঞ্চকর।'

'তুমি আবার সত্যের উপাসক হলে কবে? তুমি তো চিরকাল ঘটনার পাশ কাটিয়ে যেতে চাও দেখেছি, কঠিনকে কঠিন বলে মর্যাদা দিতে

চাওনি, কবিতার কুয়াশায় কোমল করে নিয়েছ। ভূতের মুখে রাম নাম শুনলে যে ভয় করে, মনে হয় শেখানো কথা, বইয়ে পড়া।'

'তুমি কি আমাকে চিরকাল, আজও আঘাত করবে নাকি?'

'না, তোমাকে আঘাত করতে আমার ভারি মায়া করে, পারি কই আঘাত করতে।'

নবনী চেয়ারটা আরো কাছে টেনে আনলো, প্রায় হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে, বললে, 'এবার বলো তোমার জয়যাত্রার কাহিনী।'

'শোনো। সেদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে দেখলুম তুমি নেই—তোমার ঘরটা ঝড়ে-ভাঙা, জলে-তলিয়ে-যাওয়া শূন্য একটা নৌকোর মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে।'

'আর আমি থাকলেই বুঝি নৌকোটা তখুনি দিব্যি রঙিন পাল তুলে দীর্ঘ পাড়ি দিতো? তোমার কী একেকটা মারাত্মক উপমা!'

'তুমি নেই—তাই তোমার কাকাবাবুর আপ্যায়নটা যদি দেখতে! গাঁটের পয়সা খরচ করে দোকান থেকে খাবার পর্যন্ত কিনে আনালেন! হ্যাঁ, অবাক হয়ো না, অধম আমারই জন্যে। আর কতোক্ষণে দিনাজপুরে আমাকে ঠেলে পাঠাবেন।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে যে তুমি গেছ, তোমার ছোটকাকার কাছে, যোগীনবাবু কানের মধ্যে মন্ত্র দিলেন। আশা করেছিলেন, আমি সেখানেও ছুটবো, যখন তাঁকে চিরকাল ডিফাই করে এসেছি। তোমার কাকা—অথচ দেখ কী ভীষণ স্কাউণ্ড্রেল।'

'আর তুমি অমনি দিনাজপুর ছুটলে?'

'ছুটলুম।'

'বলো কী?'

'কিন্তু তোমাকে দেখতে পেলুম না। পারো তো, আমার তখনকার অবস্থাটা একবার ভাবো। কল্পনায় যোগীনবাবুর সেই হিংস্র, কুটিল,

ক্লেদাক্ত মুখটা ভেসে উঠলো। কিন্তু, ভয় নেই, ঈশ্বর আছেন,' চেয়ার থেকে এক ঝটকায় নিশীথ উঠে দাঁড়ালো : 'হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন এখানে।'

'দিনাজপুর থেকে পূর্ণিয়ার কথা মনে পড়লো কি করে?'

'ভাবলুম, কোথায় যাই। মনে পড়ে গেলো মাসিমার কথা, আরারিয়ায় যিনি থাকেন। কিন্তু পূর্ণিয়াতে গাড়ি থামতেই ভূপতির সঙ্গে দেখা, আমার বন্ধু ভূপতি। ভারি মন নিয়ে মোটরে করে তার বাড়ি যাচ্ছি, আশ্চর্য, দোতলার বারান্দা থেকে তুমি ডাক দিলে। সবই না-হয় মানলুম, কিন্তু বলো, তুমি সেই মুহূর্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে কেন? এটা তুমি বিধাতার ইঙ্গিত বলে মানবে না?'

'এত দিনেও ইঙ্গিত?' নবনীতা হেসে উঠলো : 'তোমার দ্বারা কিছু হবে না, নিশীথ।'

'কিন্তু ভাবো একবার তোমার কাকাবাবুর দুর্দশা।' নিশীথ আনন্দের একটা নাটকীয় ভঙ্গি করলে : 'যখন শুনবে তার ফাঁদ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছি, আর, আর কোথাও নয়, একেবারে তোমার নির্জন নৈকট্যে, তখন হাতটা তার সে কী অসহ্য সুখে যে কামড়াবে নবনী, ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। সে কী একটা প্রকাণ্ড মজা যে হবে, ভাবতে পাচ্ছি না।'

'তুমি তা হলে পুজোর ছুটিতে মজা দেখতে বেরিয়েছ?'

'বা, এ ঘটনাটার মধ্যে বিরাট একটা মজা নেই বলতে চাও?'

'ঠিকই তো, তা ছাড়া আর কীই বা তুমি এতে দেখতে পাবে?' নবনীতা ম্লান গলায় বললে : 'একটু বেড়ানো হলো, কাকাবাবুর ওপরও একটা প্রতিশোধ নিলে, আর ফাঁকতালে আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে কয়েকটা রঙচঙে হালকা মুহূর্ত কাটিয়ে দিতে পারলে, মন্দ কী! খানিকটা সাস্পেন্স আর থ্রিল—আর কী চাই!'

'কিন্তু শিগগির আমার জন্যে এক গ্লাশ ঠান্ডা জল নিয়ে এসো, নবনী।' নিশীথ দু হাতে তার চুলগুলি ছড়িয়ে ছুঁড়ে দিলো; বললে,

'তোমার কাকাকে যে ঘায়েল করতে পারলুম, এই সুখই আমি বইতে পারছি না।'

'তুমি মহৎ, এত অল্পতেই তুমি খুশি হতে পারো।' নবনী চেয়ারের উপর ঘাড় রেখে শিথিল ভঙ্গিতে মুখ তুলে বললে, 'জল, সত্যি তোমার জল চাই? আজো জল চাই?'

'কি যে চাই ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার কাকাবাবু যখন রাগে মুখখানা বাসি পাঁউরুটির মতো করে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াবেন—উঃ, একটা ফটো তুলে রাখতে পারতাম!' নিশীথ হালকা পায়ে এখানে-সেখানে ছোট-ছোট পাইচারি করতে লাগলো।

'তোমার যখন আর সত্যি পিপাসা পায়নি, তখন স্থির হয়ে বোসো।'

'বসছি।' নিশীথ চেয়ারে গিয়ে বসলো। নবনীর আঙুলের আঙটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'কী করছিলে?'

'আর "কী করছিলে" নয়, "কী করবো"?' নবনী হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিলো।

'আমি এসেছি দেখে, বুঝেছি, তুমি একটুও খুশি হওনি।' নিশীথ গলাটা একটু ভারি করলো।

'খুশি হয়েছি বৈ কি, যেমন মেঘলা রাতের পর আকাশে একটুখানি চাঁদ উঠলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। তার বেশি নয়।' নবনীতার চোখে কালো কৌতুক জ্বলছে।

'তার বেশি নয়?'

'না। কেননা আবার তুমি চলে যাবে। আর চলে যাবে রিক্ত হাতেই।'

একটু স্তব্ধতা।

'আচ্ছা, এটা তো তোমার দিদির বাড়ি?'

'হ্যাঁ, আমার খুড়তুতো-দিদির।'

'আর তুমি তো জগৎবাবুর শালী, না?'

'কি করবো, অন্য পরিচয় যখন নেই।'

'আচ্ছা,' নিশীথ হাঁটুর উপর দু কনুইয়ের ভর রেখে নিচু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো : 'এখানে থাকা যায় না? প্রকাণ্ড বাড়ি— যে-বাড়িতে তুমি আছ। যে-কোনো একটা ঘর।'

'কেন,' নবনীতা ভুরু কুঁচকোলো : 'এ-বাড়িতে তুমি থাকতে যাবে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি থেকে তোমার কী লাভ হবে? আবার সেই ঘরমুখো ফিরে যেতে হবে তো একলা?' নবনী তিক্ত ঠোঁটে একটু হাসলো : 'পরের বাড়িতে থাকতেই বা তোমাকে দেবে কেন?'

'নইলে বলো, আমি কী করতে পারি?'

'কী করতে পারো! করবার তোমার আর কী মুরোদ আছে!' নবনীর গলা নিস্পৃহতায় কঠোর হয়ে এসেছে : 'এই খানিকটা আঁচলের পিছনে হালকা প্রজাপতিপনা করা, অসার কতোগুলি কথার আবর্জনায় নিজের জীবনের আসল অর্থ হারিয়ে ফেলা।'

নিশীথের মুখ যেন এক মুহূর্তে কালো হয়ে গেলো। বললে, শিশুর মতো অবোধ গলায় বললে, 'তবে বলতে চাও তোমাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি? এত দিনের সবিস্তার দীর্ঘ এই ইতিহাস সব মিথ্যা?'

'বড়ো বেশি ভালোবেসে ফেলেছ, আমাকে না হলেও তোমার নিজেকে, তাই তো হয়েছে বিপদ। কিন্তু,' নবনী কুপিত, রক্তিম মুখে বললে, 'আর কতোকাল এই শুকনো স্তব নিয়ে তৃপ্ত থাকবে জিগগেস করি, হৃদয় নিয়ে আর কতো হালকা ছেলেমানষি? সে এক দিন গেছে, গেছে। আশ্চর্য, এখনো তুমি সাবালক হবে না?'

সে এক দিন গেছে। যখন কথায়-অকথায় নিশীথ নবনীতার পায়ের পাতাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরতো, নবনীতা কুণ্ঠিত হলেও ছেড়ে দিতো না, আর বলতো, আমার সমস্ত প্রেম প্রণাম হয়ে উঠেছে তোমার মাঝে যে অনির্বচনীয়, তার উদ্দেশে। বলতো, তোমাকে যখন ছুঁই, যেন মন্দিরে

ঢুকে দেবতার মূর্তি স্পর্শ করি, আমার শরীর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে না, আমার শরীর শীতল হয়ে যায়। সেজন্য সে তাকে উৎসুক হাতে ছুঁতোও না বলতে পারো, তার শরীরময় তাপসী পবিত্রতাকে, পাছে তা আবিল, অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। মিথ্যে বলবো না, নবনীতারও তা ভালো লাগতো, তাকে ঘিরে তার এই ধূসর, বর্ণহীন অশারীরিকতা। নিজেরই কাছে নিজের এই মধুর অপরিচয়, যেমন তার এই শাড়ি, মাটির যেমন শ্যামলতা। সে এক দিন গেছে, শরীর থেকে নিঃশেষে মুছে দেয়া নিজেকে। আজ নবনীতাকে বুঝতে দেয়া হোক, সে মোমের মানুষ নয়, মাটির মানুষ। বুঝতে দেয়া হোক তার রক্ত যে লাল। তার তপস্যা-রুক্ষ কঠিন বাকলের তলায় ফুলন্ত বসন্ত, শুনতে পেয়েছে সে সাইরেনের গান। প্রতীক্ষা সে আর করতে পারে না, সে এক দিন গেছে, ছলছল চোখে জানলায় গিয়ে দাঁড়ানো, গলির বঙ্কিম প্রান্তটা যেখান থেকে শেষ চোখে পড়ে। সেই আঙুলের স্খলিত ক'টি ছোঁয়া নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। হেঁয়ালি করে কথা বলা, নিজেকে ধরতে না দেয়া। দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা করা, জীবন বলতে কেবল আগামী কাল বোঝা। সে-দিন আর নেই, ভাবের গোধূলি থেকে এখন সে নিবিড় মধ্যরাত্রে এসে পৌঁচেছে, উজ্জ্বল, উদ্ঘাটিত। স্বপ্নের ছায়াপথে অনেক বিচরণ করা গেছে, এখন চাই অবন্ধুর মাটির বন্ধুতা। গেরুয়ার পরে সবুজের প্রাচুর্য। কেটেছে অনেক বিরহ-রাত্রি, ছুরির মতো ধারালো, চোখের জলে ঝাপসা সে-সব রাত, এখন চাই রৌদ্র-ঝলকিত দীপ্ত অনাবরণ। একটি উত্তপ্ত শয্যা, নিভৃত গৃহকোণ। শান্ত, সহজ। আর সে দুলতে পারে না।

'আমার কাছে তুমি কী চাও, স্পষ্ট করে বলো।' নিশীথ চেয়ারের মধ্যে নড়ে উঠলো।

'এখনো স্পষ্ট করে বলতে হবে? তোমার বুদ্ধিকে প্রশংসা করতে পারি না, নিশীথ।'

'কিন্তু বলো, আরেক বার বলতে কিছু ক্ষতি নেই।'

'বলছি।' নবনীতা চেয়ারে নরম শিথিলতায় একটু হেলে পড়ে বললে, 'তুমি তো চলে যাবে। খুব খানিকটা স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছিলে, শেষ পর্যন্ত মজাও যথেষ্ট হলো, কিন্তু—'

কথার মধ্যিখানে নিশীথ লাফিয়ে উঠলো : 'কিন্তু আমি যেতে চাচ্ছি কোথায় ?'

'যেতে না-চাইবেই বা কেন ? আমি আছি বলে এ-বাড়িটাও তো তোমার নিজের হয়ে উঠবে না। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। চলে যে যাবে,' নবনীতার দৃষ্টি ব্যথার মতো কোমল হয়ে এলো : 'আমার কী ব্যবস্থা করলে ?'

'বলো, কি করতে হবে?' নিশীথ দ্রুত জিগগেস করলো।

'তাও আমাকে, আমাকেই বলতে হবে ?'

'বললেই বা। সমস্যাটা যখন মনে জেগেছে, সমাধানও একটা ভেবে ফেলেছ।' নিশীথ হাসলো : 'আমি কিন্তু বরাবর তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করে এসেছি, নবনী।'

'ব্যাপারটা হাসির মতো অত তরল নয়।'

'নয়ই তো। আমি কাঁদতে পারি না বলে হাসি।'

'এ-ও তা হলে তোমার একরকম কান্না। দুর্বল, অপদার্থ!' রাগে নবনীতার সমস্ত শরীর যেন নিমেষে শুকিয়ে এলো : 'তোমাকে দিয়ে আমার বা সমস্ত সংসারের কোনো কাজ হবে না।'

'বলো, কী কাজ চাই ?' নিশীথ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো : 'আলাদিনের সেই দৈত্যের কথা শুনেছ ?'

'তোমার জন্যে এ-পর্যন্ত কত দুঃখ, কত লজ্জা, কত অপবাদ সইলাম,' নবনী স্থির, শান্ত অথচ তীক্ষ্ম গলায় বললে, 'কিন্তু তুমি তার কী প্রতিকার করলে ? এই যে এখানে বন্দী হয়ে আছি, এটা কি কিছু কম অপমান মনে করো ? কিন্তু এ কার জন্যে শুনি ? আশ্চর্য, তুমি এখনো কিনা কাব্যের রোদে দিব্যি পিঠ পেতে আছ ! আমাকে কি এখান থেকে

তোমার উদ্ধার করতে হবে না? আমি এমনি করে অন্ধকূপে দম আটকে মরে যাবো? আমার জন্যে মুক্তি নেই?'

আগুনের গলিত একটা স্রোত নিশীথের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেলো। নবনীতার চেয়ারের হাতলটা মুঠোতে চেপে ধরে সে গভীর, অস্ফুট গলায় বললে, 'বেশ, চলো, আমরা পালাই। যাবে?'

'যাবো।' নবনীতা রাত্রের সমুদ্রের মতো বিহ্বল হয়ে উঠলো।

'এখুনি?'

'হ্যাঁ, এখুনি।' নবনীতা তার শিথিলায়িত খোঁপাটা মাথার উপরে চূড়া করে বাঁধলো। তার দুই চোখে জ্বলে উঠলো চতুর, ধারালো হাসি: 'কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে?'

'জানি না। যাবো, শুধু এই কথাটুকু জানি।'

'শুনতে ভারি ভালো শোনালো।' নবনীতা চেয়ারে আবার আস্তে-আস্তে গা ঢাললে। বললে, 'কিন্তু না জানলে চলবে কেন?'

'ধরো, নিরালা কোনো নদীর ধারে।' চেয়ারটা আরো কাছে টেনে নিশীথ কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া আনলো।

'সে-নদীর নাম বলো।'

'ধরো, কোনো গ্রামে, শান্ত সবুজ, মা'র আঁচলের মতো—'

'বা, গ্রামে থাকতে যাবো কেন?' নবনীতা নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'চিরকাল আমি শহরের ধুলো খেয়ে মানুষ, শহরের রূপে আমার দুই চোখ রয়েছে ডুবে, আমি পচা পানাপুকুরে ডুবে মরতে যাবো কোন দুঃখে?'

'কেন, নির্জন মাঠের উপর ছোট একটি কুঁড়ে-ঘর—যে-মাঠের তরঙ্গ দিগন্ত পর্যন্ত মিশে গেছে,' নিশীথ নিজেকে কেমন ছোট, দুর্বল বলে অনুভব করলে: 'সামনে একটুখানি ফুলের বাগান, পিছনে শাক-সব্জির খেত, নিজেদের পুকুর, বাঁধানো ঘাট, গোয়ালে গরু—'

'রক্ষে করো।' হাতের ঝাপটা দিয়ে নবনীতা নিশীথকে সরিয়ে দিলো।

নিচের ঠোঁটটা ঠাট্টায় ঈষৎ ফুলিয়ে বললে, 'শেষকালে গিয়ে আমাকে কুঁড়ে-ঘরে থাকতে হবে!'

'কেন, মাটির ঠাণ্ডা একটি ঘর তোমার ভালো লাগে না?'

'কবিতায়।'

'মাঠের মধ্যে দিয়ে উধাও-ধাওয়া হাওয়া—'

'কেন, আমার ইলেকট্রিক-ফ্যান কি দোষ করলো?'

'তোমার তা হলে তুচ্ছ কতোগুলি উপকরণ চাই, নবনী?' নিশীথের গলায় প্রচ্ছন্ন বেদনা।

'তা কিছু চাই বই কি, জীবনধারণের পক্ষে যা কিছু নেহাত সম্ভ্রান্ত।' নবনীতা পাখির গলায় হালকা হেসে উঠলো: 'অন্তত বড়ো রাস্তায় ভালো একখানা বাড়ি, বাড়ি পাকা তা মনে রেখো, সঙ্গে গ্যারাজ, আর বুঝতেই পাচ্ছ ঝকঝকে মোটর, বছরের যেটা নতুন। ড্রয়িং-রুম আর লাইব্রেরি, আর, হ্যাঁ, নতুন একটা রেডিও-সেট্।'

নবনীতাকে কেমন যেন দূর, বিচ্ছিন্ন শোনালো। ভয়ে-ভয়ে যেন বা অত্যন্ত অপরিচিতের মতো নিশীথ বললে, 'আমার সঙ্গে দুঃখ তুমি নিতে পারবে না, নবনী?'

'কোন দুঃখে?' নবনীতার বসবার ভঙ্গিতে ধূসর নিস্পৃহতা: 'তোমার জন্যে এ পর্যন্ত আর কম দুঃখ সইনি। আবার ওর কিসের প্রলোভন দেখাচ্ছ? আমি সুখী হতে চাই, সম্পূর্ণ স্থূল, সাংসারিক। তুমি তাই বা আমাকে দিতে পারবে না কেন, যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসো?'

নিশীথ লোহার মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো। গলায় ভাষা পেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'ভালোবাসা ছাড়া সত্যি আমার হয়তো আর কিছুই নেই, নবনী।'

'নেই তো তোমাকে দিয়ে আমার কী হবে?'

নিশীথ যেন নিমেষে তালগোল পাকিয়ে গেলো। জ্বলন্ত রাগ ও

অসহায় হতাশা তাকে যেন ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো টুকরো-টুকরো করে। শরীরে কোথাও যেন সে এতটুকু ভার খুঁজে পেলো না, পায়ের নিচে মাটিটা কোথায় সরে গেছে।

'তা হলে আর কি,' নিশীথ বহুদিনের রোগশয্যা থেকে যেন উঠে এসেছে : 'তা হলে আমাকে একলাই যেতে হচ্ছে।'

'একলাই তো উচিত যাওয়া।' নবনীতার গলা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন।

তবু নিশীথ সমস্ত দ্রুততা নিয়েও দ্বিধা করতে লাগলো। তাকে এত ক্লান্ত, এত নিঃস্ব, যেন কখনো দেখায়নি। যেন একটা উন্মূলিত গাছ, তলিয়ে-যাওয়া নৌকো। দরজার কাছে এসে আরেক বার সে ফিরে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজাটা আস্তে-আস্তে সংকীর্ণ করে খুললে। তাকালো আরেক বার। নবনীতা চারদিকের জলের উপর পাহাড়ের চূড়ার মতো বসে আছে। নিশ্চল, উদাসীন। নিশীথ অর্ধেক অপসৃত হয়ে যেতে-যেতে বললে, 'তবে চললুম।'

অথচ যেতেই বা তাকে দেয়া যায় কই? নবনীতার সমস্ত অস্তিত্ব যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেলো, চাপ-চাপ অন্ধকার যেন তার উপর ভেঙে পড়েছে। কী করে সে নিশীথকে যেতে দিতে পারে? সেই তার জীবনের প্রথম জানলা-খোলা, যে-জানলা দিয়ে ভোরের শুকতারাটি দেখা যায়। সে চলে যাবে মানে চারদিকের দেয়ালগুলো যেন তাকে ঘিরে, চেপে, পিষে ধরেছে : নিশ্ছিদ্র, নিশ্চেতন দেয়াল। নিশীথই যা তার জীবনের স্কাই-লাইট দিয়ে প্রথম ভোরের আলোর আভাস এসে পড়েছিলো। সেই তার জীবনে এনেছে রক্তের স্বাদ, তীব্র আর লবণাক্ত। তাকে ছেড়ে দিতেই যে আবার শরীরের সমস্ত তন্তু ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার রুটিন-আঁটা স্কুলের ঘরে সে ছিলো ছুটির ঘণ্টা। সেই প্রথম তার দুঃখের সঙ্গে মধুর মুখ-চন্দ্রিকা, দুঃখের অসহ্য যে সুখ, যে সঙ্গীত যন্ত্রণায় উঠছে অনুরণিত হয়ে। তার ভিতর দিয়েই প্রথম সে মৃত্যুকে দেখতে পায়, বিশাল অন্ধকার সে

মৃত্যু, যেমন ক্লাশের জানলা থেকে স্কুলের ছেলে মাঠের মুক্তি দেখে। তাকে ছেড়ে দিলেই বা তার চলবে কেন? যেন শরীর থেকে মুছে গেছে তার লাবণ্য, রক্তের থেকে লালিমা, চোখের থেকে শুভ্রতা, সে তবে থাকবে কি নিয়ে?

তারা-ঝরা কালো রাত্রির মতো নবনীতা চঞ্চল হয়ে উঠলো, দরজার কাছে ছুটে গিয়ে নিশীথকে বাধা দিলে, তার হাত ধরে মুহ্যমান তাকে টেনে আনলো ঘরের মধ্যে। বললে, 'আর কিছু নেই, বাবুর রাগ আছে ষোলো আনা।'

'না, আমাকে ছেড়ে দাও।' অভিমানী শিশুর গলায় নিশীথ বললে।

'ছেড়ে না দিলে তুমি কী করতে পারো?' ঘন হয়ে নবনীতা তার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, তার শরীর দীর্ঘতায় রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো লীলায়িত, নম্র, বিষণ্ণ; স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বললে, 'কী নিয়ে থাকবো তবে, যদি তোমাকে ছেড়ে দিই?' তারপর হঠাৎ কৌতুকোজ্জ্বল তরল চোখে : 'চলে যে যাচ্ছ, আমাদের বিয়ে করতে হবে না?'

'বিয়ে?' নিশীথ আস্তে-আস্তে তার চেয়ারে বসে পড়লো।

'হ্যাঁ। নইলে চিরকাল কি এরোপ্লেন করে আকাশে এমনি উড়ে বেড়াতে হবে? মাটিতে নেমে আসবো না—শ্যামল, সমতল মাটিতে, সহজ দিন-রাত্রির পরম্পরায়?'

'বিয়ে করতে হবে শেষকালে?' নিশীথ যেন অপরিচ্ছন্ন বোধ করলে।

'বিয়ে তো শেষকালেই হয়।' নবনীতার গলা সরলতায় অতলস্পর্শ : 'প্রেমের যা প্রবলতম পূর্ণতা।'

'তুমি এরি মধ্যে এতো শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, নবনী?'

'ভীষণ। আমি এবার সংকীর্ণ গিরিচূড়া থেকে গৃহ-অলিন্দে নেমে আসতে চাই।' নবনীতা যেন মধ্যরাতের ঘুম-ভাঙা শিশুর মতো অসহায় কেঁদে উঠলো : 'আমি আর এই উত্তেজনা সইতে পারি না, সব সময়ে উঁচু হয়ে এই পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে থাকা, বিশৃঙখল এই অব্যবস্থার

মধ্যে। এবার আমি নিশ্চিন্ত শয্যায় নিবিড় ঘুমিয়ে পড়তে চাই।'

'আমরা—আমাদেরও বিয়ে করতে হবে, নবনী?' নিশীথ দীর্ঘ চোখে নবনীকে দেখলে।

'আমাদেরই তো করতে হবে।'

'এমন করে আমরা পরস্পরকে ফুরিয়ে ফেলবো? আর তাই তুমি হতে দেবে সশরীরে?'

'বলো কি? আমি তো জানি, ওতে করে আরো আমরা বিচিত্র করে পরস্পরকে পাবো, জীবনের অনেক অজানা সম্ভাবনা, অজানা উদ্ঘাটনের মধ্যে। সেইখানেই তো আমরা বাড়বো, বড়ো হবো। বরং এইখানে, এমনি করেই তো আমরা দিনে-দিনে হারিয়ে ফেলছি নিজেদের।' নবনীতা আহত সুরে বললে, 'বিয়ের নামে তুমি এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছ কেন? ওখানেই তো পূর্ণতা।'

'পরিণতি বলো, পূর্ণতা বোলো না।' নিশীথের গলায় যেন নৈরাশ্যের সুর বেজে উঠলো : 'ও একটা মাত্র সামাজিক পদ্ধতি, শারীরিক সুবিধে। নইলে সেখানেই আমরা খণ্ডিত, আর অসম্পূর্ণ। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। আমার তা সহ্য হয় না, নবনী,' নিশীথ যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো : 'তোমাকে নিঃশেষ করে দিতে।'

'যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ আকাশ পুরোনো হয় না! যতক্ষণ তোমার প্রেম থাকবে জেগে, আমি অফুরন্ত হয়ে থাকবো।'

'তাকে আর প্রেম বোলো না, শুধু প্রতি দিনের সংঘর্ষে পরস্পরকে কেটে-ছেঁটে কৃত্রিম সমান করে আনা।'

'মন্দ কী, এতদিনের উদ্দীপনার পর সেই সামঞ্জস্যই তো ভালো লাগবে।'

'কিন্তু আমি মরে যাবো, নবনী, তোমাকে অভ্যাসের ধুলোয় মলিন করে দিতে।'

'সেই মলিনতাতেই তো আমার মহিমা।' নবনীতাকে ভারি উজ্জ্বল

দেখালো : 'ধূলো বলেই তো আকাশ নীল। অভ্যাসের মধ্যে থেকে সহজ যে শান্তি জীবনে সেই তো অত্যাশ্চর্য, নিশীথ।'

'কিন্তু ঘরের কোণে ছোট হয়ে থাকা, খুঁটিনাটি দুঃখ আর লজ্জা নিয়ে, সবার উপরে গার্হস্থ্য গোপনতা নিয়ে, সেই যে ছক-কাটা মুখস্ত-করা জীবন—এ মুগ্ধ করে তোমাকে?' নিশীথ বললে, 'তার চেয়ে স্বচ্ছ, স্থির, উন্মুক্ত কোনো জীবন নেই?'

'এ তোমার বইয়ে-শেখা কালেজি কবিত্ব, নিশীথ, চুপ করো।' নবনীতা ঝলসে উঠলো : 'সুস্থ হব, স্বাভাবিক হব—এর চেয়ে বড়ো ফিলজফি কিছু নেই আমার। আমি নিজেতেই কখনো শেষ নই। তাই তোমার মাঝে আমি সেই শেষ খুঁজতে চাই। তোমার ভালোবাসা কি শুধু একটা কঙ্কাল?'

'কিন্তু ভয় হয়, একদিন সেই কঙ্কালই না বেরিয়ে পড়ে।'

'ভয়? ভয় করে তো তুমি চলে যাও।'

'আর শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া চলে না এর পর।' নিশীথ যেন তার সামাজিক স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো : 'তুমি যদি বলো, ছোট ঘরে সংকীর্ণ করে তোমাকে পেতে হবে কৌতূহলহীন একঘেয়েমির মধ্যে, তাই, তোমার জন্যে ততটুকু স্বার্থত্যাগ আমি করবো। একদিন তোমাকে হারাবো বলে তোমাকে পাবো না—এ-ও আমার সইবে না নবনী। তবে তাই, তোমার কথাই রইলো।'

'বাঁচলুম। এতক্ষণে ধাতে এলে।' নবনীতার সমস্ত গায়ে শীতল একটি লাস্য ফুটে উঠলো, বললে, 'কিন্তু লগ্নটা কবে?'

'কিসের? বিয়ের?'

নবনীতা ঈষৎ ঘাড় দুলিয়ে বললে, 'ধন্যবাদ।'

'আমি যে এখনো তার জন্যে প্রস্তুত নই, নবনী।'

'তা তো চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু প্রস্তুত কবে হবে জানতে পারি?'

'পরীক্ষাটা আগে পাশ করে নিই। পরে চাকরি-বাকরি তো একটা সংস্থান করতে হবে—কী বলো?'

'তা আর বলতে।'

'আর তোমাকে তো কক্‌খনো দুঃখে রাখা চলবে না।'

'নিশ্চয়ই না। তোমার কাছে থাকবো তা-ও কিনা দুঃখে থাকবো।' নবনীতা ঢলে-পড়া চোখে একটু আহ্লাদে গলায় বললে, 'কী আবদার!'

'আর সে নিশ্চয়ই একটা ভদ্র-রকম চাকরি।'

'আশা করা যাক।'

'ততদিন তো তোমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে।'

'করবো। তবু এত দিনে যা-হোক বোঝা গেলো, কিসের জন্যে প্রতীক্ষা করছি।' নবনীতা মৃদু-মৃদু হাসলো : 'ততদিনে বুড়ি হয়ে যাবো না তো?'

'গেলেই বা। ততদিনে তুমি তো আরো বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে।'

'বাঁচা গেলো।' নবনীতা ঝলমলিয়ে উঠে দাঁড়ালো : 'তবে এই কথা রইলো, নিশীথ। ধরা যাক আর দুবছর। তুমি ততদিনে নিশ্চয়ই মানুষ হয়ে উঠেছ। তারপর—তারপরের কথা ভাবতে পারছ কিছু?'

'পারছি না।'

'জগৎ-সংসার এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে।'

'ততদিনে তুমিও নিশ্চয় বি-এ পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ।'

'কিন্তু তোমাকে বলতে কি, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেয়ে তোমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই আমার বেশি ভালো লাগবে। তোমার কাছে আমি চাই অবসর, অনেক শান্তি, অনেক বিশ্রাম।'

'আমিও তোমার কাছে হয়তো তাই চাই।'

'কক্‌খনো নয়। তুমি আমার কাছে চাও উৎসাহ আর দীপ্তি, বারুদে যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ—মনে থাকে যেন তোমাকে মানুষ হতে হবে। আমি এনে দেবো তোমাকে সেই প্রাণ, সেই প্রেরণা। পারবে না?'

'তোমার জন্যে আমি কী না পেরেছি, নবনী?'

'এই তো বীরের মতো কথা। আর ভয় নেই।' হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে নবনীতা বললে, 'জল চাই, ঠাণ্ডা এক গ্লাশ জল?'

নিশীথ হাসলো, বললে, 'না, গরম এক পেয়ালা চা।'

'চা? বোসো, এনে দিচ্ছি। সঙ্গে দিদিকেও নিয়ে আসছি। তাকে তো তুমি দেখনি। বড়োলোকের বউ।'

'বড়োলোকের বউ দেখবার আমার সাধ নেই। শোনো—'

'সে কি, শেষ কালে আমাকেই তুমি একদিন দেখতে পারবে না দেখি।'

'তোমাকে যে পাবো, সেই তো আমার অসীম বড়লোক হওয়া। শোনো।'

'কি?' নবনীতা চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো।

'দরকারী একটা কথা আছে।'

'বলো।' নবনীতা গলা নামিয়ে বললে।

যেন অনাগত দিনের একটি ছবি।

'তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবো?' নিশীথ মুখ তুলে নবনীতার নুয়ে-পড়া মুখের দিকে তাকালো। রাত্রির মতো কালো দুটি চোখের থেকে শিশিরের মতো মমতা ঝরে পড়ছে। কৃশ, স্মিত, সুন্দর মুখে অপূর্ব শান্তি, অনির্বচনীয় পবিত্রতা।

'বলবে তো আর দেরি করছ কেন?'

'আমাকে তো আজকেই যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, বিকেলের ট্রেনে। তোমাকে ছেড়ে দিতে আর ভয় নেই আমার। তা ছাড়া কাকাবাবুর উপর প্রতিশোধও তো নেয়া হয়েছে। সটান কলকাতাতেই যাবে তো?'

'যাবো। কিন্তু, আমাকে ক'টা টাকা দিতে পারো, নবনী?'

'টাকা?' নবনীতা এতোটা যেন কখনো আশা করতে পারতো না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কত?'

'কলকাতা ফিরে যাবার ভাড়া।' হাসতে গিয়ে মুখের কুণ্ঠাটুকু আরো করুণ হয়ে উঠলো নিশীথের : 'পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা আছে।'

'ও! এই কথা? এ আর বেশি কি? দেবো।'

'কোত্থেকে দেবে?'

'তা জেনে তোমার লাভ কি? তোমার পাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা।' নবনীতা সাঙ্কেতিক হাসি হাসলো : 'ছলে হোক বলে হোক পেলেই হলো। কি বলো? বোসো, আগে চা খাও, দিদির সঙ্গে আলাপ করো। কাকাবাবুর কাছে গিয়ে যে বীরদর্প দেখাবে, তার একটা এখানে নজির না রেখে গেলে চলবে কেন? বোসো, আমি আসছি এখুনি।'

কয়েক পা এগিয়ে নবনীতা ফিরে এলো, নিশীথের চেয়ারের উপর নুয়ে পড়ে কানে-কানে বলার মতো করে অথচ হাসতে-হাসতে বললে, 'পকেটে সামান্য ঐ কয়েক আনা পয়সা নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে পালাতে চেয়েছিলে, নিশীথ?'

বলে ঝরঝরিয়ে হাসতে-হাসতে নবনীতা ও-পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

২

[সাত]

তার পর দশ বছরের পর উঠলো আবার যবনিকা।

অনেক চোখের জল সাঁতরে, সময়ের অনেক মরুভূমি পেরিয়ে এবার যেখানে এসে আমরা উঠলুম সেটা মফস্বলের গেঁয়ো একটা শহর। যেখানে জ্যোৎস্নাকে সত্যি-সত্যি চাঁদের আলো বলে চেনা যায়, আর যেখানে শুক্লপক্ষ শত মেঘাচ্ছন্ন করে এলেও এক চিলতে আলো জ্বলে না ল্যাম্প-পোস্টে।

এখানে, দীর্ঘ দশ বছর বাদে নিশীথকে আমরা সামান্য ইস্কুল-মাস্টারের চেহারায় দেখতে পেলুম। তবু যা-হোক চাকরি একটা সে পেয়েছে।

রেল-ইস্টিশানের নিচে নেমে গেছে ধান-খেতের ঢেউ, তারি প্রান্তে ছোট একখানি পায়ে-চলা পথের ব্যবধান রেখে গাছের আড়ালে নিশীথের নিরীহ টিনের ঘর।

সে-ঘর অবিশ্যি তার শূন্য বলতে পারো না। সঙ্গে তার স্ত্রী আছে। মিনতি, মিনু। সংগ্রাম করে, সাধনা করে যাকে পেতে হয়নি। যাকে নিয়ে অপব্যয় হয়নি অনেক কণ্টকিত রাত্রি, বেদনায় যে নয় দীপ্যমান, কল্পনায় নয় অবারিত, অন্বেষণ করতে হয়নি যাকে উত্তপ্ত মুহূর্তের বালুচরে। দক্ষিণ থেকে অবাধে বয়ে-যাওয়া হাওয়ায় ভেসে-আসা কোনো বনফুলের অজানা সৌরভের মতো। পরিশ্রান্ত দিনের প্রান্তে কোমল এক কণা চাঁদের উন্মীলন। তাকে সে নির্মাণ করেনি, নির্বাচন করেনি, এমনি হাতের কাছে যা এসে পড়েছে, নির্মল নীল আকাশে সূর্যের অবতরণের মতো। পায়রার কবোষ্ণ-কোমল বুকের মতো যার ভীরুতা, উপর-ডালের সদ্যোজাত পাতার মতো যে মৃদুল। মোমবাতির শিখার মতো মোলায়েম। রৌদ্রে দুর্দান্ত ডানা-মেলে-দেয়া সন্ধানী কোনো পাখির মত্ততা নয়, ছায়া-ঢাকা দীঘির কালো জলের শীতল ছলছলানি। নয়

সে আর কান্নায় আর কামনায়, স্বপ্নে আর শিহরণে, সে এখন উনুনের কোণে, টেবিলের কিনারে, বিছানার পাশটিতে। বিস্মৃতির মতো সে মধুর। ছোট কপালটিতে সিঁদুরের ফোঁটায় করুণ মুখখানি গ্রামের আকাশের মতো স্নিগ্ধ, লঘু সে শরীর যেন লাবণ্যের একটি ধারা। ধূসর একটি আবছায়া। মন্দিরের নির্জন প্রশান্তি। বর্ষায় মুছে-দেয়া আকাশের নির্মলতা। মমতায় বুকটা যেন ভেঙে যেতে চায়, শীতলতায় গলে যেতে চায় যেন সমস্ত অস্তিত্ব।

কিন্তু সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে নিশীথ আপাদমস্তক থমকে গেলো।

মিনতি একেবারে ভূমিশয্যা নিয়েছে।

সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর এই যদি অভিনন্দনের নমুনা হয়, তা হলে আর কী করা যায় বলো।

ব্র্যাকেটে চাদরটা নামিয়ে রেখে নিশীথ উদ্বিগ্ন গলায় জিগগেস করলে, 'ব্যাপার কী, মিনু?'

মিনতি সুগভীর ফুঁপিয়ে উঠলো : 'তুমি এর একটা বিহিত করবে কি না বলো।'

মিনতির এমন নিঃস্ব, পরিত্যক্ত চেহারা কোনোদিন দেখা যায়নি। সন্দেহ নেই, ব্যাপার ঘোরালো। ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ গলায় নিশীথ বললে, 'কেন, কী হয়েছে?'

'যাই কেন না-হোক,' মিনতির নিচেকার ঠোঁট মৃদু-মৃদু ফুলে-ফুলে উঠছে : 'তুমি যদি এক্ষুনি, এই দণ্ডে তার কোনো ব্যবস্থা না করো—'

'কী হয়েছে ছাই না বললে আমি কী করে বুঝবো?'

'তুমি যদি তা বুঝবেই, তবে আমার এমন হাল হবে কেন?' মিনতি হাঁটুর মধ্যে ডুবে গিয়ে দস্তুরমতো কাঁদতে আরম্ভ করলে।

মিনতির এ একেবারে নতুন রকম চেহারা। সে যেন দুপুরে কোন একটা প্রখর-পিপাসিত মরুভূমি ঘুরে এসেছে। সর্বাঙ্গে তার জ্বালা,

বিরস বিবর্ণতা। তাকে যেন আর পরিচিত প্রশ্রয়ের মধ্যে ধরা যাবে না।

'অসম্ভব।' বিতৃষ্ণ মুখে নিশীথ বললে, 'খুলেই যদি না বলো, আমার কাছে তবে তোমার প্রতিকারের আশা করা বৃথা, মিনতি।'

'তা আমি জানি।' মিনতি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো : 'তোমার স্ত্রীকে লোকে অপমান করবে, অশ্রদ্ধা করবে, এ তো তোমার সৌভাগ্য। প্রতিকারই যদি করবে, সে-ক্ষমতাই যদি থাকতো, তবে তো তোমাকে পুরুষই বলতুম একশোবার।'

কোথায় কোন পুরোনো ক্ষতস্থানে যেন একটা খোঁচা লাগলো। তবু নিশীথ হাসলো; বললে, 'তদভাবে এখন বুঝি শুধু স্বামী বলো, না মিন্মু? কিন্তু,' মেঝেতে বসে পড়ে মিনতিকে, তার শরীরের নরম এক-তাল শৈথিল্যকে বাহুতে করে কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু কে আমার সোনাকে অপমান করলো শুনি?'

'কে আবার!' বাণ-বেঁধা পাখির মতো মিনতি ছটফট করে উঠলো : 'তোমাদের ম্যানেজার-সাহেবের বউ। ইহসংসারকে যিনি সামান্য একটা জুতোর সুখতলা মনে করেন।'

ম্যানেজার-সাহেবের বউ। কথাটা যেন নিশীথকে ধাঁ করে লাগলো, ক্ষতাক্ত মর্মমূলে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো তার শরীরে, নির্জনতার যে ভয়। বিশাল সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ঢেউ ঠেলে জাহাজ চলেছে মনে করো, অনেক আরোহী, অনেক কোলাহল; হঠাৎ এক ঘুম পরে মধ্যরাত্রে তুমি জেগে উঠে দেখলে কেউ কোথায় নেই, শুধু জল আর জল, আর জাহাজে তুমি চলেছ একা—সেই অবিশ্বাস্য নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক। স্তব্ধ আর ভয়ঙ্কর।

তবু সে বললে, বা বলে ফেললে : 'এখানে সে এসেছে নাকি?'

'আজ এসেছে। তাই তো শখ করে দেখা করতে গিয়েছিলুম তার সঙ্গে।' মিনতির সমস্ত মুখ রাগে গরম হয়ে উঠেছে : 'মুন্সেফ-মাসিমা আর সাব-ডিপুটি-দিদি আজ দুপুরে আমার এখানে বেড়াতে এসে-

ছিলেন গাড়ি করে, বললেন, সাহেব-গিন্নি এসেছে, চলো একবার দেখা করে আসি। হলোই বা সাহেবের বউ, বাঙালীর মেয়ে তো, ডাল-ভাত তো কোনোদিন খেয়েছে, তাই সরল বিশ্বাসে দেখা করতে গিয়েছিলুম।'

'কিন্তু কখন ও এলো না-জানি।'

মিনতি সে-কথা কানে তুললো না, তার সময়ও সেটা নয়। উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃতের মতো বললে, 'কিন্তু জানো, সবাইকে ও বসতে দিলো, আমাকে দিলো না।'

'বলো কী? বসতে বললেও না একবার?'

'বললে।' মিনতির চোখে টলটলে জল দাঁড়িয়েছে।

'কী বললে?'

'বললে, কোণের ঐ বেতের মোড়াখানা আছে, দয়া করে টেনে নিয়ে বসুন।'

'বেতের মোড়া! কেন, ঘরে আর চেয়ার ছিলো না?'

'হয়তো ছিলো, দেখিনি। না থাকলেও তো অন্য ঘর থেকে এনে দেয়া যেতো।'

'নিশ্চয়। তুমি কী করলে?'

ম্রিয়মাণ হেসে বিবর্ণ গলায় মিনতি বললে, 'সবাইর চেয়ে নিচু হয়ে ঘাড় হেঁট করে ছোট সেই মোড়ার ওপরই বসলুম।'

'বসলে?' নিশীথের শরীরের মধ্য দিয়ে যেন আগুনের একটা গলিত স্রোত বয়ে গেলো: 'তোমার লজ্জা করলো না?'

'আমার স্বামী আর-সবায়ের স্বামীর চেয়ে মাইনে কম পান সেই তো আমার লজ্জা।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না।' অন্ধ বেদনায় মৃত অতীত যেন হঠাৎ আজ গভীর আর্তনাদ করে উঠলো: 'নবনী যে এত ছোট, এত মূর্খ হয়ে যেতে পারে এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারবো না।'

'কী বিশ্বাস করতে পারবে না?'

ঈশ্বর নিশীথকে রক্ষা করেছেন। নামটা মিনতি শুনতে পায়নি।

'কিন্তু শত হলেও নিশ্চয়ই কিছু সে লেখা-পড়া শিখেছে,' ঢোঁক গিলে, শুকনো মুখে নিশীথ বললে, 'ভদ্রবংশের মেয়ে বলেও আমরা আশা করতে পারি, আর, চিরকাল এমন কিছু তার সোনায়-মোড়া অবস্থা ছিলো না। বলো, এ কখনো বিশ্বাস করা যায়?'

মিনতি স্বামীর মুখের দিকে সবিস্ময় সন্দেহে চেয়ে রইলো।

'ও-সব আমি অনুমান করছি মাত্র, কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি মিনু,' নিশীথ মিনতিকে বেষ্টন করে আদরের কিছু অমিতব্যয় করলে : 'এক বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে সে খাটো, তোমার মতো কখনোই সে সুন্দর নয়।'

'কিন্তু টাকার জলুস যে বড়ো জলুস।' মিনতি আশ্বস্ত গলায় বললে, 'তার তত মান যার যত মাইনে।'

'মিথ্যে কথা। মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব যাবে কোথায়?' নিশীথ মিনতিকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিলো। বললে, 'তুমি হেঁট হয়ে ঐ মোড়ায় বসতে গেলে কেন? কেন তুমি সটান বাড়ি চলে এলে না?'

'বাড়ি চলে আসবো কী একা-একা?' মিনতি অবাক হয়ে গেলো : 'গাড়ি যে সাব-ডিপুটি-দিদির।'

'হলোই বা। মেরুদণ্ড না থাক, অন্তত পা দুটো তো তোমার ছিলো, সোজা হাঁটা দিলে না কেন?'

'কতোটা পথ তার খেয়াল রাখো?' মিনতি অসহায়ের মতো বললে।

'শহরে তো কেবল ঐ একখানাই গাড়ি ছিলো না, আরেকটা ডাকিয়ে নিলে না কেন?'

'কিন্তু তাতে আস্ত একটা টাকা বেরিয়ে যায় যে।' মিনতি আঙুলে করে চুলের ছিন্ন একটা গুছি জড়াতে লাগলো : 'মাসের শেষে বাজারের কয়েক আনা পয়সা শুধু আমার হাতে আছে।'

সম্মান বাঁচাতে যে আবার এতো বিঘ্ন আছে তা যেন নিশীথ ভুলে

ছিলো। তবু যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখীনতাকে সে প্রতিরোধ করতে যাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে বললে, 'তাই বলে সারাক্ষণ অমনি মোড়ার মধ্যে হাঁটুর সঙ্গে চিবুক ঠেকিয়ে বসে রইলে? ন-নব—ম্যানেজার-সাহেবের বউ তোমার সঙ্গে তো একটা কথাও কইলো না।'

'কী কথা কইবে?' মিনতি নির্বাপিত মুখে বললে, 'মুন্সেফ-মাসিমার সঙ্গে কথা, কবে ওঁরা সবজজ হবেন, আর ডিপুটি-দিদির সঙ্গে কথা, কবে তাঁদের নেক্সট্ ইনক্রিমেন্ট।'

'খেতে দিলো? চা?'

'দিয়েছিলো ওঁদের উপলক্ষ্য করে। মুন্সেফ-মাসিমা দয়া করে এক প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হয়তো, কিন্তু এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওর বাড়ির একফোঁটা জলও আমি স্পর্শ করিনি।'

'তবে আর কি, যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছ।'

মিনতি যথেষ্ট খুশি হয়ে উঠতে পারলো না বোধহয়। ঝাপসা গলায় বললে, 'না, বলো, এই অপমানের কি কিছু বিহিত নেই?'

'আছে বৈ কি।'

'কী?' মিনতির চোখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'ওকে একদিন নেমন্তন্ন করে পাঠাও, তোমার এই মেটে ঘরের মেঝের ওপর সেই মহীয়সী এসে তার পা রাখুক, আর তুমি তাকে আদরে-আপ্যায়নে, সম্ভ্রমে-সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়-অভ্যর্থনায় আপ্লুত, অভিভূত করে দাও। বসতে না-হয় তাকে তুমি মাটির ওপরই আসন একখানা বিছিয়ে দিলে, কিন্তু সে যেন বুঝতে পায়, যেখানে সে বসেছে তা প্রায় সিংহাসনের মতো উঁচু।'

মিনতি স্বামীর দিকে বোকার মতো ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইলো। এ যেন কখনোই সে ভাবতে পারতো না।

আর নিশীথই বা কি ভাবতে পারতো, সামান্য ঐশ্বর্য ও শক্তি নবনীতাকে এমন জীর্ণ, এমন দুর্বল, এমন কলুষিত করে ফেলেছে?

সেই সে-দিনের নবনী।

কিন্তু নবনীতাকে দোষ দিতে যাওয়া বৃথা। কথা সে রাখেনি, এমন কথা তুমি বলতে পারো না। সমানে দুই বছর সে অপেক্ষা করেছিলো, তার বি-এ পাশ করে ওঠা অবধি, কিম্বা তারো চেয়ে কিছু বেশি, দুই বছর কয়েক মাস। বরং নিশীথই তার কথামতো কাজ করতে পারেনি, যোগাড় করে আনতে পারেনি একটা চাকরি, ভদ্রলোকের পাতে দেয়ার মতো।

ঝড়ে-ছেঁড়া কালো রাত্রে ক্যানুতে করে ফেন-স্ফীত উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চেয়ে নিস্তরঙ্গ হ্রদের উপর ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দেয়ায় অনেক বিশ্রাম, অনেক বিলাসিতা। প্রতীক্ষায় নবনীতা গলে-গলে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো, জানলা-খোলা ঘরে মোমের বাতির মতো, নিজেই সে কেবল জ্বলছে, জিহ্বা বাড়িয়ে আর-কোথাও আগুন লাগিয়ে দিতে পারছে না। কালো ক্লান্তিতে আর কতোকাল সে এমন করে মুছে যেতে থাকবে, শ্লেট থেকে পেন্সিলের দাগের মতো? রাতগুলো আর তার চোখের জলে কোমল নয়, উদাস নয় আর মদির দীর্ঘনিশ্বাসে, তারায়-তারায় জেগে-থাকা সেই অন্ধকার—সে নয় আর তার চিরবিরহের শূন্যতা। তার সমস্ত অন্ধকার আলোড়িত, মথিত হয়ে উঠছে নতুন সূর্যের সম্ভাবনায়। তার শরীর থেকে ফুটে উঠতে চাইছে পদ্ম, বেদনার চেয়েও যা সুন্দর। তার শুকনো রুক্ষতা ভস্ম হয়ে যাবে বুঝি বিপুল দাবদাহে। রিক্ততা থেকে জেগে উঠবে বা আকাশ, নির্লজ্জতায় যা নীল। নবনীতা পারে না আর পাড়ে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের ছলছলানি দেখতে, সে চায় এবার অবতরণ, অবগাহন, নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়া জীবনের শীতল সরোবরে। অনেক ডেকেছে সে নিশীথকে, কানে-কানে, কখনো বা প্রখর মুখোমুখি। প্রতিধ্বনি যা, তা ক্ষীণ, বেসুরো, যেন ঠিক মনের মতন নয়। আর, বলতে কি, সেটা নিতান্তই শুধু প্রতিধ্বনি, স্বাধীন একটা আহ্বান নয়। আর সে-প্রতিধ্বনিতেই বা শরীরে-মনে নিঃসংশয় সম্মতি

মেলে কই? যেন সব দিক দিয়ে সমস্ত শূন্যতা ভরে ওঠে না। তবু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। বলতে লজ্জা নেই, দুঃখ আর নবনীকে ভোলায় না, প্রার্থনায় সমর্পিত সেই ভঙ্গি, প্রতীক্ষায় যা ভঙ্গুর। বিষাদের খাদে সমস্ত অস্তিত্বকে নামিয়ে নিয়ে আসা, যখন সে কিনা অবাধ উচ্চ তানে অজস্র উৎসারিত হয়ে পড়বে। লজ্জা নেই বলতে, নবনীতা সুখী হতে চায়, যাকে বলে কিনা সুখী হওয়া। সে লোভ করতে ভালোবাসে, চামচে করে নয়, কামড় দিয়ে খাওয়ায়। নিশীথের মনে ফকিরের ঘরের ছবি বা হয়তো আঁকা ছিলো; ক্ষমা করো, নবনীর কাছে তা যেন হঠাৎ আশা করে বোসো না। জীবনে দুঃখ সে কিছু কম পায়নি, ঘেঁটেছে অনেক দারিদ্র্যের কাদা, তার মধ্যে মহত্ত্ব নেই, প্রেম বলেই তার পঙ্কিলতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে এ যদি বলো, তবে বলবো এও তোমার একটা কুৎসিত ভাবালুতা, কেবল কবিতায় যা খোলে। আর খালি প্রেমিক হলেই কি চলে, একটা দুর্দান্ত ব্যক্তি তো হতে হয় সমস্ত অভিব্যক্তিতে, নইলে সংকীর্ণ পর্বত-চূড়ায় অনায়াসে দাঁড়াতো এসে সে নিশীথের পাশে, নিচে যার মৃত্যুর গহ্বর—অতল আর অন্ধকার, যদি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারতো সে সেই পর্বত-চূড়ায়। শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া—তা ঐশ্বর্য-সমারূঢ় তারকিনী নিশীথিনীতেই হোক, বা হোক বিবর্ণ, দরিদ্র দৈনিকতায়। হতো তাতে দুঃখ, তাতে দুঃখ ছিলো না, যদি সে নিয়ে-যাওয়ার মধ্যে থাকতো নিষ্ঠুর দৃঢ়তা, প্রবল ও উন্মত্ত, যাকে প্রতিরোধ করা যেতো না, অভিভূত হয়ে থাকতে হতো যার দুর্দমতায়। কোথায় সেই অন্ধকার আকর্ষণ, যন্ত্রণার মতো যা অসহনীয়, যাতে ঘরের বার করে দেয়, দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হয়ে যেতে হয়, পায়ের তলায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

দোষ দিয়ো না নবনীতাকে। ব্যাপারটা সে কিছু লুকোয়নি, আর এটা প্রেম নয় যে লুকোবে। নিঃশেষে বুঝতে পেরেছিলো, নিশীথকে

ভালোবাসাই শুধু যায়, বিয়ে করা যায় না। অতটা স্থূলতা বুঝি তার সইবে না। তাকে নিয়ে জীবন রঙিন করে তোলা যায়, আলোকিত করা যায় না। জেগে রাত কাটিয়ে দেবার মতো সে মানুষ, ঘুমিয়ে নয়। তাকে নিয়ে বলা যায়, আকাশে কত আলো, যতোদিন এই আলো, ততোদিন আমাদের প্রেম, কী জ্বলন্ত-নীল, আনগ্ন-নীল এই আকাশ। তাকে নিয়ে বলা যায় না, পৃথিবীতে কতো সম্পদ, শরীরে কতো ঐশ্বর্য, মৃত্যুতে কী প্রচণ্ড নিষ্ঠুর শান্তি! এই সব চেয়ে দুঃখ, নিশীথ তাকে ভুলবে না; কিন্তু ভোলাতে হবে, নইলে নবনীতারও বা মুক্তি কোথায়? তাই চিঠিতে জানিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি, একদিন চুপি-চুপি রুদ্ধশ্বাস এক দুপুরবেলায় নিশীথের সে ঘরে এসে হাজির। যে-ঘরে তার শোয়া আর বসা, পড়া আর স্বপ্ন-দেখা। হ্যাঁ, নবনীতা নির্ভুল এসে পড়েছে, স্তব্ধতার পাষাণে পীড়িত সে-দুপুর। এসে পড়েছে প্রচণ্ড সুন্দর সেজে, প্রায় বাঘিনীর মতো সুন্দর। এসেছে কথাটা সে মুখোমুখি জানিয়ে দিতে, স্পষ্ট ও শেষ। তাদের পরিচয়ের তলায় নিজের হাতে মোটা করে দাঁড়ি টেনে দিতে, নিশ্চিন্ত সমাপ্তি। যাতে নিশীথ তাকে চিরকালের জন্যে ভুলে যেতে পারে, যাতে তাকে ঘৃণা করতে পারে সে সমস্ত শরীর ভরে, যাতে এক নিমেষে হারিয়ে ফেলতে পারে সে তার সমস্ত মূল্য, সমস্ত মহিমা। হয়ে যেতে পারে সে মুহূর্তে এক মুঠো ছাই, শুকনো দীর্ঘশ্বাসে যা উড়ে যাবে।

তা হলেই নবনীতা হয়তো শান্তি পেতো, তার নতুন জীবনে সহজ পরিমিতি, যদি নিশীথের কাছে হয়ে যেতে পারতো সে একটা পান-শেষ মৃৎপাত্র। কিন্তু কী নিষ্ঠুর নিশীথের নিস্পৃহতা। স্বপ্নের চেয়েও দূর, সূর্যের চেয়েও নিঃসঙ্গ। দুর্ভেদ্য উদাসীনতা দিয়ে সে তৈরি। কোথাও এতটুকু রেখা নেই, নবনীতা আসুক বা চলে যাক। যতক্ষণ দিনের আলো, ততক্ষণ সূর্যের আস্বাদ : এখন যদি-বা রাত্রি, তবে অন্ধকারের।

তাই, নবনীতার কী দোষ!

[আট]

শেষ-রাত্রির ধূসর প্রান্ত ঘেঁষে এখান দিয়ে ট্রেন যায়, আর তার আর্তনাদের রেখায় আকাশ বিদীর্ণ করে ভোরের প্রথম রক্তিমা ফুটে ওঠে।

সুন্দর সকাল করে এসেছে; বিস্মৃতির মতো যা নির্মল। বারান্দায় টেবিলের সমুখে নিশীথ বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে, চায়ের সঙ্গে অনুপান না হলে নয়। ভয়ঙ্কর মফস্বল, খবরের কাগজ আসে সন্ধেয়, যেখানে সব সময়ে সময় রয়েছে পিছিয়ে। এক-এক করে দিনের পাপড়ি খুলছে, লাল থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে শাদা। মিনতি ঘরময় ছোট-ছোট কাজে ছিটিয়ে পড়ছে, পায়ে-পায়ে নেচে চলেছে একটি লঘিমা। এখান থেকে কখনো তাকে চোখে পড়ছে, কখনো বা পড়ছে না। বাতাসে চঞ্চল গাছের ফাঁকে চাঁদের উঁকির মতো। সমস্ত শাড়িটিতে গত রাত্রির ঘুম মাখানো, আলস্যে জায়গায়-জায়গায় এলোমেলো জড়ো করা। চুলগুলিতে করুণ রুক্ষতা, রোদের সোনালী গুঁড়ো পড়েছে ছিটিয়ে। স্তব্ধতার বালির উপর দিয়ে পায়ের দাগ রেখে-রেখে হেঁটে যাওয়া। নরম কতোগুলি ভঙ্গি, পুজোর নিবেদনের মতো, বাহুর চমকিত একটু ডৌল, আঙুলের বা লীলা, কোমরের বা বঙ্কিমা। সমস্ত দিন চলেছে সে এই ছোটখাটো রেখায় দেয়ালে-মেঝেতে আঁকাবাঁকা ছবি এঁকে। শরীর বেয়ে যেন স্নেহের একটি ধারা নেমে এসেছে, জিজ্ঞাসা না করে নিজেকে ঢেলে দেবার তীব্রতা। বেগ নেই, বেদনা নেই, কেবল শান্তি—তার শরীরে আর মনে, এই রৌদ্রধৌত সকালবেলার মতো, গভীর অসীম শীতলতা!

'মিনু!'

হাতের কাজ ফেলে মিনতি কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'কী?'

'আরো কাছে এসো।' নিশীথ ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে দিলে।

'এই নাও। কেন?'

'তোমাকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে করলো, মিনু।' ত্বরিত হাতে তার হাতের থেকে বাহু ও বাহুর থেকে চুলে যেতে-যেতে নিশীথ তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বললে।

মিনতি চমকিত ভ্রূভঙ্গি করলো : 'কেন, আমি কি ভূত নাকি?'

'না, তবু আজ সকালে তোমাকে কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা আর অবাস্তব লাগছিলো। যেন তোমাকে ধরা যাবে না, তুমি যেন ভোরবেলার এই সোনালী রোদ।'

'কী সর্বনাশ!' মিনতি ঝরঝরিয়ে হেসে ফেললে।

'তুমি চুপ করে খানিক আমার পাশে এসে বোসো না।'

'রক্ষে করো। তোমার না হয় ছুটি, আমার কতো কাজ। ছাড়ো, উনুনটা বুঝি বয়ে গেলো।' আঁচল ছাড়িয়ে মিনতি অন্তর্ধান করলে।

নিশীথ গলা চড়িয়ে বললে, 'আবার যখন কাজ খসে গিয়ে হাত দুটি তোমার হালকা হবে, আমার কাছে চলে এসো, মিনু।'

'বয়ে গেছে।' ঘরের ভিতর থেকে মিনতি বাঁকা হাসি মাখিয়ে বললে, 'ধরা দেবো কেন, তুমি আসতে পারো না ধরতে?'

অলস, মন্থর একটি সকাল। মিনতির দুহাতের সোনার চুড়িতে ভাঙা-ভাঙা আনন্দে মৃদু-মৃদু মুখর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেশি দূর আর এগোনো গেলো না। বলা-কওয়া নেই ম্যানেজার-সাহেবের অর্ডারলি হঠাৎ এসে খবর দিলে, সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছেন।

ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মতো খবর। জানতো, তবু ত্রস্ত চাপা গলায় নিশীথ জিগগেস করলে : 'কেন বলতে পারো?'

অর্ডারলি গুরু-গম্ভীর গলায় জবাব দিলো : 'জানি না। আপনাকে এখুনি গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।'

'এখুনি?'

'এই মিনিট।'

'বটে!' নিশীথ যথাসাধ্য ঝাঁজ গোপন করে বললে, 'কোনো চিঠি-ফিঠি দিয়েছেন সঙ্গে?'

এ যেন কতো অসম্ভব এমনি একখানা নিরেট মুখ করে অর্ডারলি বললে, 'না। ঘুম থেকে এই তো সাহেব উঠলেন। সময় কোথায়? এখুনি আবার তাঁকে বেরুতে হচ্ছে মফস্বল। দুয়ারে মোটর দাঁড়িয়ে।'

'কিন্তু সঙ্গে চিঠি না দিলে কি করে বুঝবো আমারই সঙ্গে উনি দেখা করতে চান?'

'বা, আমাকে আপনি চেনেন না, বাবু?' অর্ডারলি তার কোমরবন্ধের চাকতিটার দিকে আঙুল দেখালো।

'চিনি বৈকি।' টেবিলের তলা দিয়ে পা দুটো আপ্রান্ত প্রসারিত করে দিয়ে নিশীথ বললে, 'কিন্তু আমাকেও চেনা দরকার।'

অর্ডারলি স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

নিশীথ তাকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলে। বললে, 'তোমার সাহেবকে গিয়ে বলো তাঁর চাপরাশির সামান্য মুখের কথায় তাঁকে গিয়ে সেলাম ঠুকতে আমি প্রস্তুত নই। দস্তুরমতো চিঠি চাই।'

'আচ্ছা।' পৃথিবীর কারুর কোনো তোয়াক্কা না করে অর্ডারলি বীর-দর্পে বেরিয়ে গেলো।

মিনতি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো; থমথমে মুখে বললে, 'এটা ভালো করলে না।'

'এই চাকরিটাই বা কিছু ভালো করছি নাকি?'

'কিন্তু এত বড়ো একটা জমিদারির দুর্দান্ত ম্যানেজার, যার আলোতে তোমাকে রোদ পোহাতে হচ্ছে,' মিনতির মুখ আতঙ্কে কালো হয়ে এলো : 'যার কলমের একটিমাত্র খোঁচায় তুমি অন্ধকার, তার তুমি এমন অবাধ্যতা করলে?'

'রাখো,' নিশীথ বলে উঠলো : 'এক ঘুমেই তোমার সমস্ত তেজ জল

হয়ে গেলো নাকি? তোমার চোখে কাল জল দেখেছি মনে আছে?'

মিনতি মলিন করে হাসলো : 'কিন্তু এ তো তুমি চিরকালের জন্যে ব্যবস্থা করছ।'

'তার মানে?'

'চাকরিটা যদি যায়?'

'যাবে। তার জন্যে হেঁট হয়ে বসে তোমার মতো অপমান সইতে পারবো না।'

'এ আবার অপমানের কী! আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। লোক দিয়েই তো ডেকে পাঠিয়েছে, আর নিশ্চয়ই তা তোমার স্কুলের কাজে।'

'তেমনি তোমাকেও তো একেবারে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রাখেনি, যা-হোক বসতে দিয়েছিলো তো একটা জায়গা।' নিশীথ ছটফট করে উঠলো : 'মাইনে কম বলেই মানে নেমে গিয়েছি ভেবো না।'

'যাই বলো, এ তোমার বাড়াবাড়ি।' মিনতি আবার তার ঘরের কাজে গিয়ে মন দিলে।

হয়তো বাড়াবাড়ি, কিন্তু নিশীথ যেন কোন অন্ধ নিয়তির হাতে এসে পড়েছে। তার হাত থেকে যেন আর তার ছাড়া নেই। যেন ঠেলে ফেলে দিচ্ছে তাকে অতলান্ত গভীরে। আর ঠেকানো যাবে না।

খানিক বাদে সাহেবের অর্ডারলি এসে ফের হাজির। হাতে তার এবার একটা আলগা কাগজের টুকরো।

জিভটা ভারি করে আহ্লাদে গলায় সে একটা ব্যঙ্গোক্তি করলে : 'এই নিন, বাবু। চিঠি।'

টেবিলের পায়ার সঙ্গে সুতোয় বাঁধা যে শিলপ থাকে তারই একটা ছিঁড়ে দ্রুত দমকে সাহেব ইংরিজিতে লিখে পাঠিয়েছে : 'আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে এসে দেখা করো।' মামুলি একটা সম্বোধন পর্যন্ত নেই। আর ইতিতে দস্তখৎটা তাঁর এতো বেশি জটিল হয়ে উঠেছে যে তাতে তাঁর রাগটাই শুধু বোঝা যায়, নামটা আর পড়া যায় না।

নিশ্বাসের অর্ধপথে, চোখের পলক পড়বার আগে, সে-চিঠি নিশীথ টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। মিনতি ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মাথায় যেন ছাদ ভেঙে পড়লো।

অর্ডারলি বাঁকা করে জিগগেস করলে : 'কী জবাব নিয়ে যাবো?'

চিঠির টুকরোগুলি মেঝের উপর ছুঁড়ে দিয়ে নিশীথ বললে, 'দেখতেই পেলে জবাব। যদি নেহাত বলতেই হয় তো বোলো, ভদ্রলোককে এমন করে ভদ্রলোক কখনো চিঠি দেয় না।'

'মেহেরবানি করে সেটা যদি কাগজে লিখে দেন।'

'শতং বদ, মা লিখ। মুখে না কুলোয়, পরে হস্তপ্রয়োগ করা যাবে। বলো গে তোমার সাহেবকে।'

'কর্তার যা মর্জি।' চলে যেতে অর্ডারলি ঘাড়টা একবার ঘুরিয়ে নিশীথকে দেখলে।

মিনতি বেরিয়ে এলো বাইরে। ভয়ে শুকিয়ে শাদা হয়ে গেছে তার মুখ। ঠোঁট দুটি তার থরথরিয়ে কাঁপতে লেগেছে মৃদু-মৃদু : 'এ তুমি করলে কী?'

'নিজেই তো দেখলে দাঁড়িয়ে।'

'কিন্তু এ-ইস্কুলটা কি তাঁর নয়?' মিনতি অভিভাবকের সুরে ধমকে উঠলো : 'তোমাকে কি উনি হুকুম করতে পারেন না? আর নির্বিবাদে হুকুম তামিল করাই কি তোমার কাজ নয়?'

'কাজ, কিন্তু আজ নয়।' ক্যালেন্ডারের তারিখের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিশীথ বললে, 'আজ ছুটি, আজকের দিন আমাদের আনন্দে রক্তিম। আজ উনি দরকার হলে অনুরোধই করতে পারেন, হুকুম করতে পারেন না।' মিনতিকে সে দুই হাতের মধ্যে কুড়িয়ে নিলো : 'তোমাকে নিয়ে আজ আমার আলস্য ভোগ করবার কথা।'

'ছাড়ো,' এতোটা যেন মিনতির পছন্দ হলো না : 'ওদিকে চাকরিখানা তো যায়।'

'গেলোই বা। কতোই তো যাচ্ছে। কী থাকে বলো সংসারে?'

'তাই বলে সাধ করে খোয়াবে তুমি চাকরিটা? আর পাবে একটা কোথাও?'

'খুব পাবো। কতোই তো গেলো। আবার সব ফিরে পেলুম, মিনু।'

'কী যে তুমি হেঁয়ালি বলো একেক সময়, বোঝে কার সাধ্যি? চাকরি গেলে চলবে কি করে?'

'পায়ে হেঁটে।' নিশীথ তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে: 'আমার সঙ্গে পারবে না চলতে, ঘর থেকে পথে, আলো থেকে অন্ধকারে, বিছানা থেকে গাছতলায়? পারবে না?'

'বয়ে গেছে!' মিনতি চঞ্চলতায় বেঁকে-চুরে যেতে লাগলো : 'বয়ে গেছে আমার! ছাড়ো দেখি, আমার ভাত পুড়ে যাচ্ছে, নাকে পোড়া ফ্যানের গন্ধ পাচ্ছি।'

হাতের সস্নেহ শিথিলতা থেকে মিনতি খসে গেলো। তার চলে যাওয়ার ত্বরাটুকু কী অপরূপ! তার চলে যাওয়ার ঘ্রাণে ভোরের হাওয়াটি কেমন মন্থর হয়ে এলো।

পা টিপে-টিপে নিশীথ চলে এলো রান্নাঘরে, উঠোন পেরিয়ে। ছেঁচা বাঁশের বেড়ায় ছোট একটি চালা, মেঝেটা মাটির, এবড়ো-খেবড়ো, তাই মিনতির হাতের স্নেহ পেয়ে তকতক করছে। বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে চিকরি-কাটা রোদের টুকরো এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে, কোনোটা কোণাচে, কোনোটা চৌকো, কোনোটা বা গোল। ছড়িয়ে পড়েছে মিনতির চুলে আর মুখে, আর শাড়িতে, যেন রোদের বুটিতোলা কামদার শাড়ি। মিনতি উবু হয়ে বসে ভাতের ফ্যান গালছে এনামেলের ডেকচিতে। শুকনো খোঁপাটা কাঁটা খুলে ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের উপর, আঁচলের একটা ধার কাঁধ থেকে মাটির উপর খসা, সেমিজের প্রান্তটা পিঠের অনেকখানি পর্যন্ত নেমে এসেছে, গলার নিচেকার কোমল শুভ্রতার পারে বুকের উদাসীন আভাস, সমস্ত মুখ গরমে রাঙা, দাঁত দিয়ে

নিচের ঠোঁটের একটা কোণ বা সে ঈষৎ কামড়ে ধরেছে। ফ্যান গেলে দুই হাতে ডেকচিটা বার কতক সে ঝাঁকলে, গরম ধোঁয়ায় তার সমস্ত মুখ কেমন অপরূপ অস্পষ্ট হয়ে এলো, দুই মণিবন্ধে ঘটির গোলাকার প্রান্তটা চেপে ধরে জল ঢেলে সে হাত ধুলো তারপর। তারপর গায়ের উপর দিয়ে কৃপণের মতো আঁচল আনলো গুটিয়ে, খোঁপাটা আগের জায়গায় আটকে রাখলে, সমস্ত বিস্রস্তি তার নির্মম শাসনে পরিপাটি হয়ে উঠলো।

'তুমি এখানে যে?' মিনতির দুই চোখে উৎফুল্ল কৌতুক।

'তোমার রান্না দেখতে।' নিশীথ মুগ্ধের মতো বললে, 'তোমার অঙ্গে, অন্নে, সব জায়গায় মধু, মিনতি।'

'কিন্তু যে-দাপটে তুমি চলেছ, অন্ন আর জুটলে হয়।' মিনতি আবার উনুনের পাশে সরে গেলো।

'না জুটুকু, কিন্তু তুমি তো আছ।'

'আমি তখন পুরোনো, বাসি, একঘেয়ে হয়ে গেছি।'

'আগে তাই ভাবতুম বটে, মিনতি!'

'এখন?'

'এখন ভাবি তোমার যেন কোথাও সীমা নেই। অহরহই তো আকাশ জেগে আছে শিয়রে, কিন্তু বলো, কোনোদিন তাকে পুরোনো লাগে? রোজ মনে হয় না, এ একটা নতুন রকমের দিন?'

'তুমি আমাকে আর কাঁদিয়ো না।' মিনতি ছোট-ছোট দাঁতে পরিচ্ছন্ন হেসে উঠলো।

নিশীথ উঠলো চমকে : 'কাঁদাবো না মানে?'

'মানে, তুমি যখন আমাকে এই সব স্নেহের কথা বলো,' সোনালী লজ্জায় মিনতির মুখ ঝলমল করে উঠলো : 'তখন আমার দুচোখে জল ভরে আসে।'

'তবু যা-হোক বাঁচলুম। আমি ভেবেছিলুম না-জানি কী।'

'মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই, তোমার এই ভালোবাসার।'

'রক্ষে করো। কে কার যোগ্য নয় সে-হিসেব আমরা অন্তত করবো না।' নিশীথ পিঁড়ি পেড়ে বসে পড়লো : 'আমাকে চারটি গরম ভাত দাও দেখি।'

'খাবে?' খুশিতে মিনতির সর্বাঙ্গ যেন ভরে গেলো : 'টাটকা ঘি আছে। আর একটা কাঁচা লঙ্কা। দুখানা বেগুন ভেজে দেবো?'

'দাঁড়াও, থালায় করে খাবো না।' নিশীথ লাফিয়ে উঠলো : 'কলাপাতা কেটে নিয়ে আসি।'

'তুমি বোসো, আমিই কেটে আনতে পারবো।' কোমরে আঁচল জড়িয়ে দা হাতে নিয়ে মিনতি নেমে গেলো উঠোনে।

এই মিনতিকে সে পেয়েছিলো, আশ্চর্য, একটিও বিনিদ্র রাত না জেগে। তারায়-তারায় অগণিত প্রার্থনা লিখে না রেখে। না চাইতেই এসে পড়েছিল, বৃষ্টির মতো, ঘুমের মতো, ভোরবেলায় বা জেগে-ওঠার মতো। তাকে নিয়ে এসেছিলো সে শ্রান্তির পর সামান্য পাশ ফিরতে, শয্যার উষ্ণতায়। বিদ্যুৎ-স্পন্দিত আকাশ থেকে অন্ধকার ঘরের নিভৃতিতে। শুধু খানিকটা শারীরিক সুবিধে, জৈব সামঞ্জস্য—দুই ভুজ সমান হলে তাদের কোণগুলিও সমান, এমনি একটা জ্যামিতিক প্রতি-পাদন। কিন্তু জ্যামিতির মাঝেও যে এতো রহস্য ছিলো তা কে জানতো—বিশাল এই পৃথিবী, সেও তো বিধাতারই জ্যামিতি। যা মাত্র সুবিধে তাইতেই আবার লীলা, যা মাত্র সামঞ্জস্য তাইতেই কতো পূর্ণতা। কিসের মধ্যে যে কী আছে কে বুঝে উঠবে, শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তো! মিনতি এমন কিছু একটা অত্যুজ্জ্বল সুন্দর নয়, গলিত আগুনের মতো, জ্বলন্ত-শুভ্র দুঃস্পৃশ কামনার মতো, কিন্তু কতো সুন্দর আর স্নিগ্ধ, যখন সে আধখানা বেঁকে দাঁড়িয়ে রান্না করে, সমস্ত ভঙ্গিটি তার মমতায় নোয়ানো, যখন হেঁটে-হেঁটে সে শুকনো বেণী ছাড়ায় লীলায়িত আঙুলের চপলতায়, যখন স্নান করে এসে—শিশির-ধোয়া

ঘাসের মতো সবুজ তখন তার শরীর—কপালে সিঁদুর আঁকে, চিরুনির ডগায় করে সীমন্তে দেয় টেনে, যখন দিনের সীমান্তে চলে এসে আয়নায় দাঁড়িয়ে সে আবার চুল বাঁধে, সমস্ত গায়ে তার ধুলো-মাখা ধূসর ক্লান্তি থাকে এলোমেলো হয়ে, যখন সন্ধ্যার শেষে গা ধুয়ে নির্মল সন্ধ্যাতারাটির মতো সে জেগে ওঠে তার ধোয়া পরিচ্ছন্ন শাড়িটিতে। এই সব তুচ্ছ সাধারণতার মধ্যে যে এতো সুধা এরি বা কে সন্ধান পেয়েছিলো আগে? সামান্য ঘাসের ডগায় যে শিশিরের কণা তারো মাঝে আকাশের আনন্দ ওঠে ঝিলিক দিয়ে। সমস্ত শরীর বেয়ে উপচে পড়ছে এই আনন্দের মদিরা—নিজের মাঝে আঁটছে না আর এই মিনতি। অথচ তার আনন্দ এটা-ওটা ঘরের কাজে, এখানে-ওখানে নাড়া-চড়ায়, ধরতে গেলে কোনো কিছুতেই নয়। শুধু যে সে বাঁচতে পারছে আরেকজনের জন্যে এই তার সুখ।

মিনতি কলাপাতা নিয়ে এলো। হাত দিয়ে ভাত বেড়ে দেবে, এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে। 'দ্যাখো, এলো বুঝি আবার।' মিনতি শঙ্কাকুল মুখে বললে, 'এবার না জানি কি বলে!'

'গর্দান নিলে বোধহয়।' নিশীথ বাইরে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো সে মুহূর্তে, হাতে একটা খামে-মোড়া পুরু কাগজের চিঠি। বললে, 'আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলে না।'

'কেন, কী হ'লো?'

'এবার দস্তুরমতো লেফাফায় চিঠি এসে হাজির। না গিয়ে আর উপায় কী বলো?'

'যাক, শেষ পর্যন্ত লিখিয়েছ তো ওকে দিয়ে।' মিনতি খুশিতে উছলে উঠলো : 'কী লিখেছে?'

'সেই পুরোনো কথা। দেখা করতে হবে গিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকটি অক্ষর একেবারে সাপের মতো ফণা তুলে আছে। ভেতর থেকে স্পষ্ট দাঁত দেখতে পাচ্ছি।' নিশীথ ব্যস্ত হয়ে উঠলো : 'আমি চললুম।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার ভাত বেড়ে রেখেছি, খেয়ে যাও দু'গরস।'

'সময় হবে না মিনু।'

'যথেষ্ট সময় হবে।'

'ফিরে এসে খাবো।'

'ফিরে এসে খাবে বৈকি, সে তো ঠান্ডা, জুড়োনো ভাত। শোনো, মাথা খাও।'

নিশীথ থামলো।

মিনতি কাছে এসে দাঁড়ালো। শান্ত, একটু-বা বিষণ্ণ মুখে বললে, 'অতো ভয় কিসের? ম্যানেজার-সাহেব বড়ো জোর তোমার ভাতের গ্রাসটাই কেড়ে নেবেন, তা নিন, তাই বলে আজকের তোমার এই মুখের গ্রাসটা মারা যেতে দেবে কেন? এসো, চট করে মেখে দিচ্ছি। আমিও কিছু ভাগ নিয়ে তোমার পরিশ্রমটা কমিয়ে দেব না-হয়।'

'সেই ভরসা মিনু,' নিশীথ রান্নাঘরে যেতে-যেতে বললে, 'চাকরিটা গেলেও তুমি থাকবে।'

'আর সেটা তখন কাঁধের ওপর ব্রহ্মদৈত্য হয়ে।' মিনতি হেসে ফেললে; পরে ঈষৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'ইস, মুখের কথায় চাকরিটা অমনি গেলেই হলো কিনা।'

[নয়]

সমস্তটা রাস্তা নিশীথ সাইকেল চালিয়ে এসেছে, ফটকের সামনে এসে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেরও অজানতে কেন যেন হঠাৎ একটু পীড়িত বোধ করলে। জামা-কাপড়টা আশানুরূপ ফর্সা নয়, ঘুম থেকে উঠেই দাড়ি কামানো যদিও অভ্যাস নয় তবু কামিয়ে এলে মন্দ হতো না, আর পাঁচটা-আঙুল-বার-করা স্যান্ডেলটা যেন একটা উপহাস! এত লক্ষ্য করবারই বা কী আছে! একটু দরিদ্রের মতন দেখাচ্ছে, তা দেখাক।

যাচ্ছে তো সাহেবের কাছে, প্রায় একটা যুধ্যমান ভঙ্গিতে, বেশভূষার পারিপাট্যে তার হবে কী?

ফটকের গায়ে সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে নিশীথ কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লো। সামনেই সাহেবের নতুন মোটরটা আরোহীর জন্যে তৈরি।

পায়ের তলায় লাল কাঁকর মাড়িয়ে নিশীথ অগ্রসর হচ্ছিল। ভয় একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ, আর সে-ভয়ের মধ্যে যদি-বা একটু অগোচর আশার মিশেল থাকে।

বেয়ারা এলো এগিয়ে। কেতা-কানুন সব উগ্র আধুনিক, কাগজের টুকরোয় নাম লিখিয়ে নিয়ে গেলো।

'আনে দেও।' ভিতর থেকে বজ্রগর্ভ একটা গর্জন হলো।

পরদা সরিয়ে ভিতরে যেতেই সমস্ত ঘর চারপাশের দেয়ালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাহেব তার বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে আছে একরাশ সুসজ্জিত বিশৃঙ্খলা নিয়ে—এমন চমৎকার চেহারা যে অতি বড়ো শত্রুরও হঠাৎ ভক্তি হয়। সমুদ্ধত স্ফার-বক্ষ, পেশল দুই কাঁধে দুর্ধর্ষ বলদৃপ্ত, সমস্ত বসবার ভঙ্গিটাতে একটা মহনীয় নিষ্ঠুরতা। মাথার সামনে খানিকটা টাক পড়েছে বলে কপালটা অনেক বিস্তৃত মনে হয়, নাকটা খড়্গের মতো উদ্যত, চিবুকটা তীক্ষ্ণতায় কুটিল। বিশাল দুই থাবায় সমগ্র জীবন সে আঁকড়ে, অধিকার করে বসেছে। প্রসাধন-পরিচ্ছন্ন মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল, উদাসীন। তার সমস্তটা উপস্থিতি কেমন বলোচ্ছ্বসিত, উদ্বেল।

নিশীথের বুকের ভিতরটা অজানা ভয়ে হঠাৎ কেঁপে-কেঁপে উঠলো।

সাহেব তার নামের শ্লিপটা আঙুলের ডগায় করে পাকাচ্ছিলো। ক্ষণিক একটা মুহূর্ত হয়তো কাটলো না, সাহেব উঠলো একটা বিশাল হুঙ্কার দিয়ে : 'কতো মাইনে পান জিগগেস করি?'

প্রশ্নটার জন্যে নিশীথ মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। কান দুটো তার

অসহ্য গরম হয়ে উঠলো, নিজেকে কেমন যেন সে ছোট, অসহায়, বিধ্বস্ত মনে করলে। বললে, যথাসম্ভব সংযত গলায়ই বললে, 'সেইটে জানবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' সাহেবের গলা নির্লজ্জ আর নিষ্ঠুর।

'বলবার মতো সেটা কিছু নয়। আর সেটা শুনেও কিছু আপনার আহ্লাদ হবে না।'

'তবু সংখ্যাটা একবার আমি শুনতে চাই স্বকর্ণে। আপনি তো একটা ইস্কুল-মাস্টার?'

'হ্যাঁ, আরো নিচে চলে যেতে পারতুম।' নিশীথ নির্দয় হাসিমুখে বললে।

'তাই যাবেন।' সাহেবও তেমনি ক্রূর হাসলো : 'আপনাকে ডাকতে কবার চাপরাশি পাঠাতে হয় জিগগেস করি?'

'নিজে সশরীরে গিয়ে ডাকলে একবারও পাঠাতে হয় না।'

'বেশ।' সাহেব কথাগুলো চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে, 'সামান্য ইস্কুল-মাস্টার হয়ে আপনার স্পর্ধা কতোদূর উঠতে পারে তাই দেখবার জন্যে আপনাকে এখানে ডাকিয়েছি।' সাহেব টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এলো : 'আমার চিঠি পেয়েছিলেন আগেরটা?'

'যেটা ডাকে এসেছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'পেয়েছিলুম।'

ভিতরের দরজা ঠেলে কে যেন আস্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নিশীথের দৃষ্টি তখন সাহেবের মুখের উপর নিবদ্ধ, তাই চোখ কৌতূহলে ছিঁড়ে পড়লেও সে ফিরে তাকালো না। শুধু একটা জ্বলন্ত উপস্থিতির সে ঝাঁজ অনুভব করলে। যেন পুঞ্জিত তুষার অভ্রভেদী পাহাড়ের ওপর শয়ান। নিরেট, নীরেখ। ঘূর্ণ্যমান একটা ঝড় যেন

উত্তপ্ত স্তব্ধতায় এসে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত অপসরণের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেই, উদাসীনতায় সে এতো দুর্ভেদ্য।

'চিঠি পেয়েছিলেন তো ছেলেদের নিয়ে প্রসেশান করে খেয়াঘাটের দিকে যাননি যে আমাদের রিসিভ করতে?' সাহেব রুখে উঠলো।

শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় নিশীথ বললে, 'ওটা ছেলেদের কারিকিউলাম-এর মধ্যে পড়ে না বলে।'

'কিন্তু আপনি, আপনি নিজে গেলেন না যে বড়ো?' সাহেব অসহ্য অস্থির হয়ে উঠলো।

'আমার কাজ ছিলো।'

'কাজ ছিলো?' সাহেব যেন আর নিজেকে চেয়ারের মধ্যে ধরে রাখতে পারলো না : 'তোমার এ কাজ—'

'রাখো নির্মল,' সেই তুষারীভূত উপস্থিতি হঠাৎ স্নিগ্ধ নারীকণ্ঠে অপরূপ হেসে উঠলো : 'সামান্য একটা ইস্কুলের মাস্টার তোমাকে অভ্যর্থনা করতে যায়নি বলে তুমি যে ক্ষেপে গেলে দেখছি।'

কথার ধারাটা তির্যক একটা বাঁক নিলে। তাই চকিতে নবনীতার দিকে চোখ না ফিরিয়ে আর থাকা গেলো না। অনেক দিন পর তাকে দেখলো—কতোদিন পরে, নিশীথ ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। এর মধ্যে অনেক সমুদ্র যেন বয়ে গেছে।

আগের চেয়ে নবনীতা অনেকটা মোটা হয়েছে বলে মনে হলো, এটুকু মেদবর্ধন না হলে তার এই পদস্ফীতির সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খেতো না—চিবুকটা অনেক ভারি, তারি নিচে দুয়েকটা বা ভাঁজ পড়েছে, পাউডারের বিমলিন রেখায় যা বোঝা যায়, চোখ দুটো আরো ছোট, কাঁধ দুটো কেমন অর্ধবৃত্তাকার, কিন্তু আশ্চর্য, গলার স্বর তার বদলায়নি এতোটুকুও। অনেক দূর থেকে শুনলেও যেন তা চেনা যেতো। শেষ হয়ে যাবার মুহূর্তে তার হাসিটি তেমনি এখনো করুণ, ম্লান হয়ে আসে। চিবুকের পাশে ছোট্ট টোলটি শুধু নেই।

'তোমার এ-কাজ এ-মুহূর্তে আমি শেষ করে দিতে পারি, জানো?' নির্মল চাবুকের মতো লাফিয়ে উঠলো।

নিশীথকে আড়াল করে নবনীতাকেই সে-কথার উত্তর দিতে শোনা গেলো : 'রাখো, ছুঁচো মেরে তোমাকে আর হাতে গন্ধ করতে হবে না।'

নিশীথের স্পষ্ট মনে হলো দেয়ালগুলো যেন নির্লজ্জ অট্টহাস্য করে উঠেছে। নবনীতার দিকে আরেকবার সে তাকালো, তার উদ্ঘাটিত, জ্বলন্ত শাড়িটার দিকে, বসন্ত-বিহ্বল বনানীর মতো যা উন্মাদ—তার সাফল্য, তার স্থৌল্য, তার সজ্ঞান সচকিত শারীরিকতার দিকে। অবজ্ঞা না করলে আর তাকে মানায় না, নাকের উপর থেকে করুণায় একটু হাসা, ভঙ্গিতে দুশ্ছেদ্য নির্লিপ্ততা নিয়ে। স্পষ্ট ঘৃণা হলেও বুঝি একটা প্রতিরোধের আনন্দ আছে, কিন্তু অকায়িক এই ঔদাসীন্য!

'কিন্তু জানো,' নির্মল এবার তার সহধর্মিণীকে সম্বোধন করলো : 'এমনি করেই বিদ্রোহ শেখানো হচ্ছে। এই যত সব গোঁয়ার, অবাধ্য মাস্টারের জন্যে। আচ্ছা, আমি দেখে নেব।'

'তার চেয়েও আমাদের যে আজ আরো জরুরি জিনিস দেখবার ছিলো।' নবনীতা চঞ্চল হয়ে উঠলো : 'আমাদের এখুনি যে মফস্বলে বেরুতে হবে তার খেয়াল নেই? নাও, ওঠো, সক্কালবেলা তোমাকে আর বসে-বসে বেত-হাতে মাস্টারি করতে হবে না।'

'হ্যাঁ, তুমি তৈরি তো?' নির্মল এবার উজ্জ্বল ঋজুতায় উঠে দাঁড়ালো।

'কখন থেকে।' নবনীতা একটু ঢলে-পড়া দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীর দিকে।

'রাইট-ও! গাড়ি বার করেছে?' নির্মল নিশীথের দিকে বিরক্তির তীব্র একটা চাউনি ছুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

আর তার পিছু-পিছু নবনীতা। প্রত্যক্ষ পাশ কাটিয়ে।

সেই ঘরে নিশীথ ক্ষণকাল নিরবলম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। পরে যন্ত্রচালিতের মতো সেও এলো বেরিয়ে।

বারান্দার এক পাশে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার সঙ্গে কথাটা তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি।

তার উপস্থিতিটা তখন যেন আর আমলে আনবার নয়, নবনীতা আর তার স্বামীর মধ্যে কথাবার্তাটা এমনি নিভৃত হয়ে এসেছে।

'রাস্তার ওপারে ঐ যে বাগানে রাজ্যের ফুল ফুটে আছে, ওটা কার বাড়ি বলতে পারো?' নবনীতা তার স্বামীকে জিগগেস করলে।

নির্মল উত্তর করলো : 'হরবিলাস সিকদার—আমাদের কাচারির জমানবিশ।'

'তবে তো আমাদের নিজের লোক।'

'একেবারে আমার বুড়ো আঙুলের তলায়।'

'বলো কি?' নবনীতা লাফিয়ে উঠলো : 'তবে ও সমস্ত ফুল আমার চাই।'

'এতোদিন বলোনি কেন?'

'আমার বাগানটা আরো রঙিন করতে হবে। চাইলে দেবে তো?'

'দেবে না মানে? এ সমস্তটা,' নির্মল তার হাত দিয়ে শূন্যে একটা অসীম পরিধি রচনা করলো : 'এ সমস্তটা আমাদের জমিদারি, আমার এলেকায় জানো?'

'কিন্তু ধরো যদি আপত্তি করে?'

'আপত্তি করবে! কে আপত্তি করবে?' নির্মল প্রকাণ্ড একটা শব্দ উদ্গীরণ করলো : 'আবদুল হুসেন!'

'হুজুর।' নেপথ্য থেকে ততোধিক ক্ষিপ্রতায় কে প্রতিধ্বনি করে উঠলো।

'আর, আজকে হাট আছে না?' নবনীতা স্ফূর্তিতে উথলে উঠেছে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'এখানকার হাটে খুব ভালো হরিণের শিঙ ওঠে শুনেছি।'

'বিস্তর।'

'গারো-পাহাড়টা বুঝি খুব কাছে?'

'একেবারে। চলো না, রেলোয়ে-ব্রিজটা পেরিয়ে গেলেই পাহাড়ের আঁকাবাঁকা আবছা আভাস পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু হরিণের শিঙ আমার চাই। আর চামড়াও গোটাকতক।' নবনীতা একটু আদুরে গলায় বললে।

'যতো খুশি।' সাহেব তার ট্রাউজারের পকেট থেকে লম্বা পাইপ বার করলো।

'কিন্তু পয়সা লাগবে নাকি?'

দাঁত দিয়ে পাইপটা কামড়ে ধরে নির্মল, অসার সংসারে পয়সা যেন কত্তো তুচ্ছ এমনি ঔদাস্যের সঙ্গে বললে, 'না, পয়সা কিসের।'

'হ্যাঁ, দেখো, বাবুগিরিতে খামোকা আমি পয়সা ব্যয় করতে প্রস্তুত নই।' নবনীতা যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করলো, গলায় জোর দিয়ে বললে, 'ও-সব আমি চেয়ে নিয়ে আসবো। আমরা চাইলেই তো ও দিতে বাধ্য। নয়?'

'একশো বার।'

'যে-লোক হাটে ও-সব জিনিস বেচতে এসেছে, নিশ্চয়ই সে আমাদের প্রজা।'

'ওর প্রপিতামহ পর্যন্ত।'

'আর নিশ্চয়ই ওর অনেক দিনকার খাজনা বাকি পড়েছে।'

'তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

'তবে আর কি। ও না দেয় ওর প্রপিতামহ দেবে।' নবনীতা বন্য গলায় অদ্ভুত হেসে উঠলো : 'চলো আগে ঐ ফুলের হাটটা লুট করে নিয়ে আসি।'

বাঙলোর বারান্দা থেকে বহিরঙ্গনে মোটরটা যেখানে দাঁড়িয়ে, দশ গজ রাস্তা হবে কিনা সন্দেহ। নিশীথ নবনীতার সেটুকু রাস্তা পার হয়ে যাওয়াটা সম্ভোগ না করে পারলো না। নিশীথকে যে সে দেখতে পায়নি

এ-কথাটা জানাবার জন্যে সে ব্যস্ত, অথচ সে যে কী সুখী, কী ভয়ঙ্কর সুখী সে-কথাটাও কিনা নিশীথকেই তার জানাতে হবে।

নবনীতার এটুকু দুর্বলতাকে নিশীথ ক্ষমা করতে পারতো অনায়াসে। নবনীতাও আসলে মেয়েই। জলের উপর তেলের মতো যারা ভাসতে চায়। যারা নিজেদের সৌভাগ্যগর্বকে নিজেদেরই মহত্ত্বের মর্যাদা বলে মনে করে : মনে করে, যেন কোন অলক্ষ্য গুণের জন্যে বিধাতা তাদের এই প্রভূত সম্মানিত করেছেন—এটা তাদের ন্যায্য মূল্যে, প্রাপ্য অধিকার, এটা তাদেরই নিজের-হাতে-গড়া অমোঘ কীর্তি। এটা ভাগ্যের দান নয়, স্বীকার। নবনীতার যে অনেক রূপ আছে, এ কেবল ভাগ্যদেবতারই চোখে পড়েছিলো, তাকে যে মানায় না সেই তপস্যাশীর্ণ রিক্ততায় সে ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারতো না—তাই এই যে তার অনর্গল অজস্রতা এটা এমন কিছু অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত নয়, এটা তারই জন্যে নির্ধারিত, তার উপযুক্ত পুরস্কার। তাই, আশ্চর্য, এই উদগ্র ও উচ্ছ্বসিত সুখের সঙ্গে নিজের সংগতি খুঁজে নিতে নবনীতাকে এতোটুকুও কষ্ট করতে হয়নি। এতো সব বাহুল্য আর বিস্রম্ভ। এই অহঙ্কার আর তেজ। এই লোভ আর লজ্জাহীনতা। সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে নিটোল খাপ খাইয়েছে। এতোটুকু তার ক্লেশ বোধ হয়নি, নতুন আবহাওয়ায় এসে শরীরে-মনে প্রথমতম যে অস্বস্তি। সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলো, তার সেই কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিল থেকে ঝকঝকে এই মোটর-কারে। কোথাও একটা সে হোঁচট খেলো না, এবং এই মোটরটাতেই যেন স্ফূর্তি পেয়েছে তার জীবনের ছন্দ। নিশীথ তাকে গেরুয়া পরিয়েছিলো আর নির্মল তাকে সবুজ, ভেনাসের মতো সবুজ, যে সবুজ হচ্ছে প্রগল্ভ প্রচুরতায়। সেই তরঙ্গিত সবুজে তার তপস্যারুক্ষ শীর্ণ শ্রীর ক্ষীণতম রেখাটিও আর চোখে পড়ে না। বিহ্বলতায় ভঙ্গিম হয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর, সেই সব কৃশ ও করুণ কোণগুলি আর নেই, সেই ঝরে-পড়া লীলা আর ফুটে-ওঠা লাস্য, সেই স্নেহ-স্নাত শান্তি :

সমস্ত কিছু আজ উচ্চারিত ও উগ্র, তার এই ঋজুতা ও কাঠিন্য, এই দাম্ভিকতা ও দৃপ্তি। যাই বলো, চমৎকার মানিয়েছে তাকে। মহিমান্বিতার মতো।

নিশীথ তাকে ক্ষমা করতে পারতো ইচ্ছে করলেই, কিন্তু কে বলবে কে জানে, ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মতো কুৎসিত একটা ঘৃণা তার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে পিচ্ছিল হেঁটে গেলো। প্রেম চায় হয়তো একটা স্মৃতি, মৃত ও মৌন, যার উপর দিয়ে ইচ্ছেমতো কল্পনার দাগা বুলোনো যায়, কিন্তু ঘৃণার জন্যে চাই স্থূল উপস্থিতি, স্পর্শসহ বর্তমানতা। নইলে নবনীতা যদি থাকতো তার মনের গহনে, স্মরণে আর সৌরভে, তবে হয়তো সে-অতীত মরতো না ব্যর্থতায়; কিন্তু নবনীতা আজ আরেকটা নতুন পরিচ্ছেদে চলে এসে সে-অতীতকে যেন প্রবল বিদ্রূপ করছে : তার এই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, অসম্পৃক্ত অস্তিত্বটাই অসহনীয়। নিশীথ যেন অসহায় বোধ করতে লাগলো। নবনীতার চারপাশে নেই আর সেই নিভৃত শুচিস্মিতি, সেই উন্মুক্ত পবিত্রতা; পান-পাত্রের পীতাবশেষ তলানির মতোই সে আজ অস্পৃশ্য, আবিল আর অপরিচ্ছন্ন, তবু তার থেকে নিশীথ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। তার এই পতনের মধ্যেও যেন একটা বলিষ্ঠ উজ্জ্বলতা আছে, তার এই সম্ভোগ ও সমৃদ্ধির মধ্যে। মুগ্ধের মতো নিশীথ তাই যেন অনেকক্ষণ দেখতে লাগলো, তার লজ্জা করলো না।

নবনীতা মোটরে এসে বসেছে, বার দুই দুলে বসাটা সে ঠিক করে নিলে। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগের গহ্বরে সে মনোনিবেশ করলে, কখনো আয়নায় দেখলো মুখ, রুমাল দিয়ে ঠোঁটের লালচে কোণ দুটো বা মুছলে, কখনো বা পাউডার-র‍্যাগ দিয়ে নাকের দু-পাশ ও গলাটা একবার রগড়ালে। চুলটা ঠিক করবার কল্পনায় বার কতক আঙুলের সূক্ষ্ম ভঙ্গি করলে, বুকের আঁচলটা আরো একটু সংক্ষেপ করে আনলে। সমস্তই যেন তার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক।

মুঠো করে পাইপের মুখটা চেপে ধরে নির্মলও অগ্রসর হলো। বয়েস একটু বা বেশি, দীর্ঘতায় দৃঢ়, শক্তিতে গর্বিত, তেজস্বী সেই শরীরে তাকে ভারি চমৎকার মনে হলো নিশীথের, প্রায় দেবতার আবির্ভাবের মতো। তার ঋজু উদ্দীপ্ত পৌরুষ যেন নবনীতার কাছে প্রকাণ্ড একটা আশ্রয়, তার প্রতাপ ও প্রাবল্য। নির্মল তার বিলিতি পোশাকে নিভাঁজ ও অটুট, স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে সমুজ্জ্বল, সৌভাগ্যে-সম্পদে অগ্রগণ্য—নবনীতার নির্বাচনকে প্রশংসা করতে হয় বৈকি।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আর দেখছেন কী এখানে?' নির্মল নিশীথের দিকে খেঁকিয়ে উঠলো।

লজ্জায় নিশীথের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো। সত্যি, এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দেখছিলো কী? তার দৃষ্টিতে হয়তো বা ছিলো অসহায় নৈরাশ্য, দরিদ্র লোলুপতা। হয়তো তার ক্ষণকালের জন্যে ঘৃণা করবার কথা আর মনে ছিলো না। নিশীথ চাপা, ঝাঁজালো গলায় বললে, 'আমার সঙ্গে কথাটা আপনার এখনো শেষ হয়নি।'

'অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে।' নির্মল বুলেটের মতো বললে, 'আজ রাত্রেই আপনি চিঠি পাবেন, আমরা অন্য মাস্টার নেব।' বলে নির্মল দরজা খুলে নিচু একটা লাফ দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো। নবনীতা তাকে ঘনীভূত সান্নিধ্য দিলে।

এর পর আর এখানে দাঁড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু নিমেষে নিশীথের হাতের মুঠোটা আলগা, গলাটা শুকনো, পায়ের পাতা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—অকস্মাৎ তার এই চাকরি যাওয়া! রাগ সে করতে পারে, করতে পারে অনেক অহঙ্কার, উড়তে পারে দূরচারী কল্পনায়, কিন্তু সম্প্রতি চাকরিটা তো তার গেলো!

মোটরটার দিকে আরেকবার হয়তো সে তাকিয়েছিলো লুক্কায়িত লুব্ধতায়, কিন্তু নবনীতা হঠাৎ শূন্যে একখানা হাত বাড়িয়ে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো : 'গোর্কি! গোর্কি!'

গোর্কি! নিশীথের বুকের ভিতরটা হঠাৎ দুলে উঠলো। নামটা কোথায় যেন সে শুনেছে, কবে!

কোথা থেকে, কী বিচিত্র রঙ তার কে নাম জানে, নিচু, ছোট, নরম একটা কুকুর আধ-বিঘৎটাক লিকলিকে জিভ বার করে ছুটতে-ছুটতে নবনীতার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবনীতা তাকে নিয়ে উত্তপ্ত উথলে উঠেছে।

এঞ্জিনটা বেগের তাড়নায় ঝকঝক করে উঠলো, ঘুরে গেলো ফটকের দিকে, আর, ভাগ্যের এমনি রসিকতা, গাড়িটা না বেরুনো পর্যন্ত নিশীথ যাবার পথ পাচ্ছে না।

মুক্তি পাবার জন্যে মোটরটা কয়েকবার এ-পাশ ও-পাশ করলে। নিশীথ ভাবলো, ভাবতে তার ভয়ানক লজ্জা করা উচিত, একবার হয়তো নেপথ্য থেকে একান্ত করে নবনীতাকে চোখোচোখি একটুখানি দেখতে পাবে—একটুখানি, চোখের কোণায় পালকের কণিকতম চাঞ্চল্যে। কিন্তু নবনীতা তখন তার কুকুরকে নিয়ে ভারি ব্যস্ত—পৃথিবীর কোনো দিকেই তার লক্ষ্য নেই। সে যে সুখী, ভীষণ সুখী, এ-কথাটা জানাতে পারলেই সে বাঁচে।

গাড়ির শব্দের সঙ্গে নির্মল ও নবনীতার মিলিত হাসির রোল হাওয়ায় কল্লোলিত হয়ে উঠলো।

[দশ]

নিশীথের সাইকেলের শিকলের শব্দ শুনতেই মিনতি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। রান্নাবান্না তার সারা, সব থালা চাপা দিয়ে এসে ঘরের এটা-ওটা সে তদারক করছে। তাকে নতুন করে খবরের কাগজ পাতলো, বিয়ের সময় যে কয়খানা বই উপহার পেয়েছিলো, তাদের মলাট বদলে ফের রাখলো গুছিয়ে, তেঁতুল দিয়ে মেজে কাঁসার রেকাবি দুখানা

ঝকঝকে করলে, চুন দিয়ে ঘষে হ্যারিকেনের লণ্ঠন দুটো, আচারের বোয়মটা দিলে রোদ্দুরে; যেমন কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, নিশীথের জুতোতে কালি লাগিয়ে চুড়ি বাজিয়ে বুরুশ করে দিলে। এবার স্নানের ঘরে কোনটা-কোনটা কাচতে নিয়ে যাবে, বালিশের অড় আর রুমাল, তারই সে সূক্ষ্ম তারতম্য করছিলো, এমনি সময় নিশীথের আওয়াজ পাওয়া গেলো। হাতের বালিশটা আর্ধেক পথে ফেলে রেখে সে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, হাসি-মুখে কৌতুকে ভর-ভর চোখে সে জিগগেস করলে : 'কি হলো?'

'চাকরিটা গেলো, মিনু।'

'গেলো?' এক ফুঁয়ে মিনতির মুখের রক্ত যেন কে শুষে নিলে।

'একেবারে।'

'অপরাধ?'

'ঈশ্বর জানেন।' নিশীথ ঘরের ভিতরে এসে বসলে, পাটি-পাতা তক্ত-পোশের উপর।

মিনতি মশারির চালের থেকে পাখাটা তাড়াতাড়ি পেড়ে আনলো, মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে-করতে বললে, 'কোনোই দোষ নেই?'

'চাকরি যেতে কোনো দোষ লাগে না।' নিশীথ উল্‌টোনো তোশকের উপর আস্তে হেলান দিলো : 'যে-কোনো একটা ছুতো পেলেই হয়।'

'ঝগড়া করেছিলে বুঝি?'

'ঝগড়া করবারও সুযোগ দিলে না, এত দ্রুত আর আকস্মিক ব্যাপারটা ঘটে গেলো।'

মিনতি ম্লান, ক্লান্ত গলায় বললে, 'কোনো কারণ নেই, মাঝখান থেকে চাকরিটা এমনি খসে যাবে?'

'খুঁজে দেখলে কারণ তুমি একটা পেতে পারো বৈকি।'

'কি?'

'যেদিন সাহেব তার মেম-সাহেবকে নিয়ে আসেন,' নিশীথের গলাটা

ব্যথায় ঝাপসা হয়ে এলো : 'সেদিন ছেলের দল নিয়ে নিশান উড়িয়ে খেয়াঘাটের দিকে যাইনি কেন ওঁদের বরণ করতে, এই অপরাধ। অন্তত এই তো আমি আমার চামড়ার চোখে দেখতে পাচ্ছি।'

'ওরা এমন কী নবাবের বংশধর যে ওদের শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলতে হবে?'

'অন্তত জ্ঞাতি-কুটুম্ব বলে মনে করে। আমাকে আগে থাকতে চিঠি দিয়েছিলো বটে একটা,' নিশীথ একটু ভয়ে-ভয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো : 'আমি সেটা অমান্য করেছি।'

'বেশ করেছ।' মিনতি জোর দিয়ে বললে।

'বেশ্ করিনি, মিনু।' নিশীথ কষ্টে একটু হাসলো : 'এখন মনে হচ্ছে গেলেই পারতাম একটা সঙের মিছিল নিয়ে। চাকরিটা থাকতো।'

'একেবারে পুরোপুরি না বলে দিয়েছে নাকি?' মিনতিরও গলা সহানুভূতিতে একটু সজল হয়ে এলো।

'মৌখিক বলে দিয়েছে, তারপর রাত্রে পাকাপাকি একটা চিঠি আসবে খালি।' মিনতির হাত থেকে পাখাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, বললে, 'আর হাওয়া খাবার বাবুগিরির সময় নেই, মিনু। এবার থেকে নিষ্ঠুর কষ্ট সহ্য করবার দিন এলো।'

'সে যেমন দিনই হোক, সেদিনও তোমাকে সেবা করবার আমার শক্তি থাকবে।' মিনতি কী সুগভীর স্নেহে আর সুখে স্বামীর পাশটিতে এলো ঘেঁষে।

'জানো, তোমার বেলায় মেম-সাহেব করেছিলো অপমান, আর আমার বেলায় সাহেব। আমাকে প্রথমেই কী জিগগেস করলে জানো?' নিশীথের গলা হঠাৎ তেতে উঠলো : 'বলে কি : কতো মাইনে পান, মশাই? সামান্য ইস্কুল-মাস্টার হয়ে আপনার এতোদূর আস্পর্ধা?'

'বললে?' মিনতি স্তব্ধ হয়ে গেলো।

'দেখ একবার তার হিংস্র ঔদ্ধত্য। না-হয় সৌভাগ্যের চূড়ায় এসে

বসেছে, তাই বলে ভদ্রতাটা কি অশোভন? যে-লোক পথের ধুলোয় পড়ে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল রথের চাকা চলে যায়, মিনু।'

'গেলে গেছে এই চাকরি।' মিনতি সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠলো আকস্মিক : 'বেশ করেছ, ওটাকে যে ছুঁড়ে দিয়েছ লাথি মেরে। চাকরি একটা গেলো বলে ভয় কিসের?'

মিনতির ঠাণ্ডা, উন্মুক্ত বাহুর উপর গাল রেখে নিশীথ বললে, 'কিন্তু তোমাকে ভীষণ কষ্টে ফেলবো, মিনু।'

'কষ্ট? তোমার সঙ্গে খালি সুখ ভোগ করতে হবে এমন কোনো আমি চুক্তি করে এসেছি নাকি? নাও, ওঠো, ঘামটা এবার মরেছে।'

'তোমাকে সুখী করতে পারলুম না এই শুধু আমার দুঃখ।'

'তবে আর-কী, রাস্তায় ছুঁড়ে বার করে দাও আমাকে, কাঁধটা তোমার একেবারে হালকা হয়ে যাক।'

হাত বাড়িয়ে মিনতিকে নিশীথ ধরে ফেললো।

'সুখ, আমাদের সুখের তুমি কী বুঝবে বলো? চাকরি নেই, কষ্টে পড়লুমই না-হয় কিছুকাল যতদিন আরেকটা না যোগাড় হয়, ততোদিন তোমার সঙ্গে যে কষ্ট ভোগ করবো সেই তো আমার অনন্ত সুখ।'

'মনে হয় যেন সুন্দর একটা বই পড়ছি।'

'বিশ্বাস না হয়, কষ্টে তা হলে ফেলো না।' মিনতি উচ্চ শব্দ করে হেসে উঠলো : 'যাবার মধ্যে গেছে তো একটা মাস্টারি, তায় মুখখানা করেছে দ্যাখো না।' হঠাৎ উৎসারিত অজস্রতায় স্বামীর সে গলা জড়িয়ে ধরলো, ঢলে পড়লো বুকের উপর : 'চাকরি গেছে, কিন্তু আমি তো যাইনি।'

'কিন্তু কতোদিনে কোথায় আবার কী চেহারার যোগাড় হয় তা কে বলতে পারে?'

'পরের কথা পরে। এখন তুমি ওঠো, চান করো।' বলে মিনতি চাকরের সন্ধানে ব্যস্ত হাঁক পাড়লে : 'বিষণ, ওরে ও বিষণধারী।'

বিষণধারী পেয়ারা-গাছের থেকে নেমে আসতে পারলে বাঁচে।

'যা, বাবু আজ নদীতে যাবে না, টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল নিয়ে আয়।' তার পর তেলের বাটি নিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে : 'দাও, গেঞ্জিটা ছেড়ে দাও। কেচে দেবো।'

'কী হবে!' নিশীথ উদাসীনের মতো বললে।

'কী হবে মানে?' মিনতি প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো : 'চাকরি গেছে বলে জামা-কাপড়গুলো ফর্সা করতে হবে না নাকি?'

'এমনি করে কদ্দিন?'

'আজীবন।'

'কিন্তু রাত্রেই তো পাকা চিঠি আসবে।'

'সে তো রাত্রেই। তার আগে, তাই বলে এই দিনের বেলায় তুমি স্নানাহার করবে না নাকি?' নিজের কথা বলার ধরনে নিজেই মিনতি হেসে ফেললো।

তবুও নিশীথের মুখ গম্ভীর : 'তোমার জন্যে চাকরিটা খোয়াতে আমার হাত সরছে না, মিনু।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কাছে নিমেষে যেন ছোট, নিরর্থক হয়ে যাবো।'

'তাই, কী করতে চাও?' মিনতির দৃষ্টি বিদ্রূপে ঈষৎ বাঁকা।

'আরেকবার দেখতাম চেষ্টা করে। কাউকে দিয়ে ধরিয়ে।' নিশীথ ভয়ে-ভয়ে বললে।

'খবরদার।' ঝরনার জলে রোদের ঝিলিকের মতো মিনতি দুই চোখে জ্বলে উঠলো : 'সেইখেনেই তো তুমি ছোট হয়ে যাবে, আমার কাছে না হলেও তোমার নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে। সেই অপমানই বরং তুমি সইতে পারবে না।'

মিনতি নিশীথের রুক্ষ চুলগুলি আঙুল দিয়ে চিরতে লাগলো : 'মোটমাট এই জীবনধারণই একটা মজার ব্যাপার, কখনো তার সুখ,

কখনো বা দুঃখ। দুঃখকে ভয় করলে জীবনে আর স্বাদ নেই।'

'দাও এগিয়ে তেলের বাটিটা।' নিশীথ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো, যেন বা উত্তাল উৎসাহে। দক্ষিণ থেকে প্রসন্ন বাতাস এসেছিলো, এক মুহূর্তে ঝরে গেছে যেন তার সমস্ত জীর্ণতা। সে প্রস্তুত।

এই দিনটি তাদের কী চমৎকার যে কাটলো প্রজাপতির রঙচঙে পাখায়, কখনো বা নিস্তরঙ্গ নদীর আলস্যে। স্নান করে এসে ভেজা চুলের কাঁড়ি নিয়ে মিনতি পরিবেশন করলো, নিশীথকে আগে দিয়ে নিজেরটা পরে বেড়ে নিলে। যা বা নিশীথের অবশিষ্ট থাকলো তাই সে পরম পরিতৃপ্তিতে নিঃশেষ করলে, কোনো কিছু অপচয় হতে দিতে তার মন সায় দেয় না। মিনতি জল খায় না খেতে বসে, ছেলেবেলার অভ্যেস, অনেক দিন পর্যন্ত সেটা বাঁচিয়ে এসেছে। এখন জল গড়ালো কুঁজোর থেকে স্বচ্ছ কাচের গ্লাশে। পান আগের থেকেই সাজা, ঠোঁটের সঙ্গে-সঙ্গে সে এবার সীমন্ত রাঙালে। সব কিছুই তুচ্ছ, নিরানন্দ প্রাত্যহিকতার মতো দেখাতো যদি প্রত্যহের মতোই থাকতো আজ, হায়, নিশীথের সে-চাকরি, সব কিছুকেই মনে করা যেতো তখন জীবিকার উপকরণ, আগামী কালের পটভূমি। কিন্তু আজকের দিনে মিনতির এই আনন্দময় ছবিটি যেন বিশেষ, বিচিত্র একটা সৃষ্টি, তার এই লহর আর লঘুতা। যতোক্ষণ দিন আছে আকাশে, ততক্ষণ সে দীপ্তি দেবে না কেন? এখানকার এই নদীটার আঁকাবাঁকা রেখা ধরে শহর গড়ে উঠেছে, জানলা দিয়ে তার শান্ত শীর্ণতা চোখে পড়ে, রুপালী রোদে তার কুণ্ঠিত গা মেলে দেয়া। চেয়ার পেতে বসলো তারা পাশাপাশি। মিথ্যে নয়, এমনি আরো তারা বসেছে, কিন্তু শিথিল ঘুমন্ত মেয়ের মতো নদীটিকে কখনো এমন শ্রীমতী মনে হয়নি। তার ওপারে যে সবুজের তরঙ্গ চলে গেছে দিগন্তে, আর তারই ভাঙা-ভাঙা চূড়ায় আড়ালে-আবডালে যে ছোট-ছোট বাড়ি রয়েছে ছবির মতো আঁকা, সমস্ত কিছুই নিশীথের নজরে পড়েছিলো, কিন্তু আজকের মতো এমন জীবন্ত বলে কোনোদিন মনে হয়নি। ঐ

সবুজ কে তার অজস্র স্নেহ দিয়ে মাটির রুক্ষতা থেকে উৎসারিত করেছে, তার অস্তিত্ব সে আজ অনুভব করলে, ঐ কুঁড়ে ঘরে যারা থাকে, তাদেরও বিছানা চাঁদের আলোয় ভিজে যায়, তাদেরও হাসিতে ভোরের আলোটি বিকশিত হয়, তাদেরই আশায় আকাশে নতুন মেঘ করে আসে। তাদেরও ঘরে প্রেয়সী আছে, এবং কে না স্বীকার করবে, তারা চিত্তে এনেছে ঔৎসুক্য, শরীরে এনেছে আনন্দ, জীবনে এনেছে আস্বাদ! কে না স্বীকার করবে তারাও কালো চোখে এনেছে করুণা, অধরে এনেছে শান্তি, বুকে এনেছে আশ্রয়! সুখ? সুখ কাকে বলে? সুখ কোথায় আছে? নিশীথ সরে এসে মিনতিকে স্পর্শ করলো, তার হাত টেনে নিলো তার হাতে—কিসের ভয়, কিসের দুঃখ, যতোক্ষণ তুমি আছো আর আমি আছি।

বিকেলে তারা রেল-লাইন ধরে বেড়াতে বেরুলো, যেটা প্রায় অসাধারণ। হাঁটিতে-হাঁটিতে তারা শহরের ইশারাটিও পার হয়ে এলো, একেবারে অচেনা গ্রাম্যতার মধ্যে। আশ্চর্য, এখানেও লোক থাকে এবং সুখেই থাকে। মিনতি কখনো শ্লিপারের উপর দিয়ে বড়ো-বড়ো পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে, কখনো বা বিচ্ছিন্ন একটা লাইন ধরে আঁকাবাঁকা ভাঙা-ভাঙা পায়ে শরীরের ভর রেখে, যতোক্ষণ না পড়ে যায় তাল কেটে, কোথায় বা তার ঘোমটা কোথায় বা তার কী—পথের ধারে দেখছে বা কোনো অনামী বুনো ফুল, তুলে এনে খোঁপায় দিচ্ছে গুঁজে, পাখির ডাকের অনুকরণ করে কখনো বা শিস দিয়ে উঠছে সুরেলা। আশ্চর্য, কোথা থেকে নদীটা আবার দেখা দিলো, পড়ন্ত আলোয় টলটলে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রয়েছে : দ্যাখো, দ্যাখো, নৌকোয় কেমন ওরা বাসা করে রয়েছে, কাঠের উনুন জেবলে দিব্যি শুরু করে দিয়েছে রান্না। কত জল ঘেঁটে কত দূর দেশ থেকে এসেছে না-জানি, কত জল ঘেঁটে আরো কতো দূর দেশে না-জানি যাবে! কেমন সুখে আছে ওরা। এই পথ দিয়ে হাটের থেকে সওদা করে কত লোক গাঁয়ে ফিরে চলেছে, যার-যার বাড়িতে, কেউ বা ডাইনের লাল

পথ দিয়ে, কেউ বা সমুখের শাদা পথ দিয়ে, কেউ বা সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজা। ডালায় করে বাজারে ফুটি বেচতে এসেছিলো, সামান্য ক'টা যা বিক্রি হয়েছে তা দিয়ে বোতল করে পোয়াটাক কিনে নিয়ে চলেছে কেরোসিন, রাত্রে আলো জ্বালবে। শাক বেচে শুধু দুটি পয়সা মোটে রোজগার, তাই দিয়ে শালপাতার ঠোঙায় কিনে নিয়ে চলেছে ফেনি-বাতাসা। এত সব দরকারী জিনিস থাকতে বাতাসা কেন? না, মেয়েটার আজ জ্বর ছেড়েছে, খেতে চেয়েছে হালকা মুড়মুড়ে বাতাসা। বাড়ি গিয়ে মেয়ের মুখে ও হাসি দেখবে। পথের কিনারে ছোট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে, হাতে তার একটা লালচে ডালিম। একটা পয়সা পেলে ও তা দিয়ে দিতে পারে। ডালিমটা তো পাকা নয়; আরে, পাকলে তো তার দাম চার পয়সা হতো। কী করবে সে পয়সা দিয়ে? না, কাল ভোরে উঠে ঘুড়ি ওড়াবে। নিশীথ দিয়ে দিলে একটা পয়সা, আর চেয়ে নিলো সেই ডালিম। ছেলেটির স্বপ্নে যা লাল, আকাশে তার ঘুড়ি ওড়াবার স্বপ্ন। কাল ভোরে উঠে সে ঘুড়ি উড়তে দেখবে, যেমন আমরা রাত্রির জঠর থেকে সূর্য উঠতে দেখি। এরা সবাই নিশীথের অপরিচিত, কিন্তু এদের প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সে হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে, এদের রহস্যময় জীবন-যাত্রা, এদের রহস্যময় অপসৃতি। সুখী? আমি সুখী নই, এ-কথা বলবার কার আছে অধিকার? সুখী না হতে পারাটাই তো আত্মার নিদারুণ অবমাননা।

'রাত হলো, এবার ফিরি।' মিনতি একটু-বা আর্ত, ভীত কণ্ঠে বললে।

রাত হলো। পশ্চিমের দেয়াল ভেঙে নেমে আসছে তমিস্রার স্রোত, রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নের মতো ফুটে উঠছে বা দুয়েকটা তারা, পথ-ঘাট অস্পষ্ট হয়ে এলো। সমস্তটা জায়গা বড়ো বেশি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। দূরের গ্রাম অস্পষ্ট মসীরেখার মতো অবাস্তব। সীমাহীন আকাশে তারা দুজনে চলেছে পাশাপাশি।

বাড়ি ফিরে এসে মিনতি তার নৈশ সংসারানুষ্ঠানের কিছুমাত্র শৈথিল্য

হতে দিলো না। চাকর সময় বুঝে উনুনে আগুন দিয়ে রেখেছে, কমিয়ে রেখেছে লণ্ঠনের পলতে, পা-হাত ধোয়ার জন্যে এনে রেখেছে জল। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে ততোক্ষণে মিনতি পেতে নিলে তাদের বিছানা সেই সফেন রমণীয়তায়। আর সব সে চাকরের হাতে ছেড়ে দিতে পারে, রান্না-করা আর বিছানা-পাতাটা শুধু নয়। এ দুটো তার নিজের ঐকান্তিক রচনা, তার স্নেহ আর সুষমার। এ দুটোতেই তার মুক্তি।

মিনতি চলে গেছে রান্নাঘরে আর নিশীথ বসেছে এসে তার পড়ার টেবিলে। নিশ্বাসে-নিশ্বাসে ঘনিয়ে আসছে কালো রাত। রাত্রেই চিঠি আসবে, মিনতির মরা-মুখের মতো সে-চিঠি, তবু তার জন্যে অপেক্ষা না করে বহুদিন পর বাক্সের অন্ধকার গহ্বর থেকে কতোকালের পুরোনো ম্যাক্সিম গোর্কিখানা বার করে এনেছে। তখন তার দুর্ধর্ষ যৌবন, যে-বয়েসকে রাশিয়াই কেবল মুগ্ধ করে। অধোগতদের বেদনা, বন্দী আত্মার আকাশস্পর্শী কাকুতি, মহীয়ান তেজস্বী সব বিরাট ব্যর্থতা। আঙুলে-আঙুলে কয়েকটা পৃষ্ঠা সে আস্তে-আস্তে উল্টে গেলো। পাতাগুলি লালচে হয়ে এসেছে, অক্ষরগুলি কেমন করুণ, এখানে-ওখানে পেন্সিলের কটি দাগ। সেই কটি টুকরো-টুকরো অস্পষ্ট দাগের মধ্যে কবেকার একটি ভুলে-যাওয়া স্মিত, কৃশ মুখ নিশীথের চোখের সামনে বারে-বারে ভেসে উঠতে লাগলো—যেখানে-যেখানে নবনীতার ভালো লেগেছিলো, হৃদয় উঠেছিলো সাড়া দিয়ে, আনন্দে চোখ হয়েছিলো উজ্জ্বল, এ কটি বিচ্ছিন্ন রেখায় তা যেন নিখুঁত একটি ছবির মতো আঁকা আছে। সেই তার 'বত্তিচেলি'র মুখ, সরল ও প্রশান্ত। যেখানটায় নিশীথ খুলে বসেছে, সমস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে ম্লান, ধূসর একটি সন্ধ্যা, বাতি-না-জ্বালা ঘরের অপরূপ মোহময়তা। অক্ষর হয়তো তখন আর দেখা যায়নি, না যাক; সত্যি করে বলতে কি, অক্ষর এখনো কিছু নিশীথ দেখতে পাচ্ছে না, তবু তার চারপাশে সেদিনের ব্যথিত সেই স্তিমিত সন্ধ্যাটি নীরবে নিশ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কতোক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, মিনতি হাতে একটা মোটা খাম নিয়ে এসে বললে, 'চিঠি।'

'এসেছে?' নিশীথ যেন ঘুমের মধ্যে থেকে চম্‌কে উঠলো।

'আসবে তা তো জানতেই।'

'কখন এলো?' চিঠিটা নিশীথ হাতে নিলে।

'চাপরাশি বিষণের হাতে দিয়ে গেছে, ও আমাকে দিলে। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক কথা রাখলো যা-হোক।'

'বোসো আমার পাশে এই চেয়ারটায়।'

'তা বসছি।' মিনতি নিশীথের চেয়ারের হাতলের উপরে ঠেস দিয়ে বসলো, তার সার্টের চওড়া কলারটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

'হাসছ যে?' নিশীথ জিগগেস করলে।

'চিঠিটা খুলতে তুমি এত দেরি করছ বলে।'

'যতোক্ষণ না খোলা যায় ততোক্ষণই তো শান্তি।' নিশীথ মিনতির বাহুর উপরে গাল রাখলে।

'এইটেই আবার তোমার শোকের ভঙ্গি।' নিশীথের চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে রেখে মিনতি বললে, 'যতো বড়ো দুঃসংবাদই হোক শেষ পর্যন্ত খুলতেই হবে চিঠিটা। তার আগে শোক করবার কোনো মানে হয় না।' মিনতি টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিযে বললে, 'দাও, আমার কাছে দাও।'

ক্ষিপ্র, অসহিষ্ণু আঙুলে নিশীথ নিষ্ঠুরের মতো খুলে ফেললো সে চিঠির মোড়ক। একবার পড়লে, আরেকবার। লণ্ঠনের শিখাটা আস্তে উস্কে দিয়ে আরো একবার।

এর চেয়ে চাকরিটা গেলেই হয়তো ভালো ছিলো। চিঠিতে লেখা :

'এ-যাত্রায় তোমাকে ক্ষমা করা গেলো। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান।'

'এর চেয়ে চাকরিটা গেলেই ভালো ছিলো, মিনু।' চিঠিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে নিশীথ উঠে দাঁড়ালো।

'ভালো ছিলো মানে?' মিনতি সাত-পাঁচ কিছু বুঝতে না পেরে কুড়িয়ে নিলো চিঠিটা। অর্ধেক নিশ্বাসে সেটা শেষ করলে। লাজুক হাসিতে ভরে গেলো তার সমস্ত শরীর, বললে : 'যায়নি, যায়নি তো তবে চাকরিটা?'

'যাওয়াই উচিত ছিলো।' নিশীথের গলায় চাপা রাগ!

'বটে!' ঠাট্টায় ঝিলকিয়ে উঠলো মিনতি : 'তা হলেই বুঝি এবার সুখী হতে?'

'কিন্তু ক্ষমা, ক্ষমা করতে যাবে কি বলে?'

'দোষ ধরতেও ওরাই ধরলো, ক্ষমা করতেও ওরাই করলো, এর মধ্যে তোমার কিছু হাত নেই—সবই ভাগ্যের পরিকল্পনা। নাও,' পিছন থেকে দুহাত দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে কোমলতায় ঝুঁকে পড়ে মিনতি বললে, 'যে-রাতকে এত ভয় করেছিলে, এসেছে সেই রাত।'

'কিন্তু, মিনু—' নিশীথের গলাটা কেমন বিরস, অনার্দ্র।

'তোমাকে নিয়ে আর পারলুম না। গেলেও কেন গেলো, আর থাকলেও কেন গেলো না? নাও, ঘরে রইলোই যখন চালটা অটুট হয়ে, তখন এরি মধ্যেই আকাশ আমাদের তৈরি করে নিতে হবে। সর্বনাশ,' মিনতি ছিটকে বেরিয়ে গেলো : 'ওদিকে পুড়ে গেলো বুঝি রান্নাটা।'

মিনতি আবার তার ছোট-ছোট কাজে রাত্রির স্তব্ধতায় জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠতে লাগলো।

আলোয় চিঠিটা নিশীথ আবার পড়লে। বাংলায়-লেখা সেই চিঠিটা। অক্ষরগুলোও কেমন গোল হয়ে উঠেছে আস্তে-আস্তে, কোণীয় কৃশতাগুলো গিয়েছে ডুবে। নেই আর তাতে সেই এলানো একটি লাস্য, নিভৃত আলস্য দিয়ে যা তৈরি, সমস্তটা ভঙ্গি এখন দ্রুত, দীপ্ত, দাম্ভিক। শুধু 'ম'-য়ের পুঁটলিটি এখনো আছে, অস্পষ্ট শৈশবের সারল্য দিয়ে ভরা। চিঠিটা নিশীথ ছিঁড়ে ফেলতো, কিন্তু 'ম'-য়ের সেই পুরোনো করুণ চেহারা দেখে তার মায়া করতে লাগলো।

[এগারো]

নারানগড়ের বিস্তৃত জমিদারিটা বহুদিন থেকেই এক বিলিতি সওদাগরের হাতে বাঁধা পড়েছে—নির্মল ছিলো সে-আফিসের মাঝামাঝি একটা জায়গায়, নিতান্তই গায়ের জোরে ঠেলে এসেছে উপর-তলায়, এখন একেবারে বসেছে এসে প্রতাপান্বিত ম্যানেজারের গদিতে।

তারই নির্লজ্জতা কতোদূর যেতে পারে সমস্ত শহরতলি আর গ্রাম সাশ্রুচোখে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নিশীথের সঙ্গে হরবিলাসের দেখা, হরবিলাসেরই দোরের গোড়ায়। শিশু-সন্তানকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে মা যেমন দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, সমস্ত বাড়িটার সে-রকম চেহারা।

'এমন হাল কে করলে, বিলাস?' নিশীথ অবাক হয়ে গেলো।

'আর কে!'

'সাহেব?'

'আরেক ডিগ্রি ওপরে। মেম-সাহেব।' হরবিলাসের গলা বেদনায় ভারি হয়ে এলো।

'হ্যাঁ, তোমার এই বাগানের ওপর তাঁর চোখ পড়েছে শুনেছিলুম।' নিশীথ চারদিকে একবার চোখ ফেরালো : 'তা একটি পাপড়িও তিনি রেখে যাননি?'

'ফুল নিয়ে গেছে তাতে আমার দুঃখ ছিলো না। কিন্তু আমার গাছ,' হরবিলাসের কথার মধ্যে কান্না ঠেলে উঠতে লাগলো : 'কতো দিনের কতো সাধের আমার গাছ, কতো রোদ আর বৃষ্টি, কতো সকাল আর সন্ধে, কতো রাত্রির স্বপ্নে সবুজ সব আমার গাছ সমূলে উপড়ে তুলে নিয়ে গেছে, মাস্টার।'

'তুলে নিয়ে গেছে?'

'অনেক। দিশি আর বিলিতি, যা কিছু তার চোখে ধরলো—সমস্ত।'

'তোমার চোখের উপর দিয়ে?' নিশীথ যেন অস্থির বোধ করলে।

'উপায় কী! চাকরি থাকে না, মাস্টার। মেম-সাহেবের হুকুম। সূর্যের চেয়েও বালির তাত যে বেশি।'

'কিন্তু কাল যদি এসে তোমার গোয়ালের একটা গরু চায়?'

'দ্বিধা পর্যন্ত করতে দেবে না। তখন এই বলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবো, মেম-সাহেব দয়া করে কেবল একটা গরুই চেয়েছিলেন। তুমি জানো না বুঝি, মাস্টার,' হরবিলাস নিশীথকে তার বৈঠকখানায় নিয়ে এলো, তক্তপোশের উপর মুখোমুখি বসে গলা নামিয়ে বললে, 'মেম-সাহেব নিজে তশীলে বেরুচ্ছেন আজকাল।'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ,' হরবিলাস হতাশ মুখে বললে, 'পাইক-বরকন্দাজ মাঠে গিয়ে প্রজা ঠ্যাঙাচ্ছে, আর মেম-সাহেব তাঁর বিলিতি থলেটা নিয়ে সোজা অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ছেন।'

'সেখানে কী?'

হরবিলাস হাসলে, সে-হাসিতে তার দীর্ঘকালব্যাপী জমিদারির অভিজ্ঞতাটা কূট হয়ে ফুটে উঠলো, বললে, 'গলায় কারু হয়তো একটা হাঁসুলি দেখলেন, সভ্য সমাজের ফ্যাসানে সেটা অচল অতএব সেটা ফ্যাসান-হিসেবেই মূল্যবান, বলে বসলেন—ওটা তাঁকে দিতে হবে।'

'দাম?'

হরবিলাস তেমনি কুটিল করে হাসলো : 'ওর সোয়ামীর খাজনা বাকি নেই? তেমনি, গারো-হাজংদের কারু হয়তো দেখলেন একখানা শাড়ি ঝুলছে দড়িতে—হলোই বা না ঝুলটা নিতান্ত ছোট, কিন্তু পাড়, বর্ডারটা তো নতুন ধরনের—পরা না যাক, অন্তত ছোটো-খাটো টেবিলের তো ঢাকনি করা যাবে—হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতে পর্যন্ত তাঁর তর সয় না। খাজনা যখন দেবে না, তখন যাবে কোথায়?'

'বিশ্বাস করি না।' নিশীথ কঠিন হয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবার কথাও নয়।' হরবিলাস বিস্বাদ, বিবর্ণ গলায় বললে, 'মেয়েমানুষের এই বন্য দুর্দান্ত লোভ চোখ মেলে আর দেখা যায় না, মাস্টার। ও-সব তো তোমাকে আমি দামী জিনিসের ফিরিস্তি দিচ্ছি, ঘটি-বাটি থালা-বাসনের কথা তো কিছুই বলিনি। যা কিছু অত্যন্ত সেকেলে, তাই তাঁর কাছে বেশি লোভনীয়। নিজে ব্যবহার না করুন, কিউরিয়ো হিসেবে ঘর তো সাজানো যাচ্ছে।'

'বিকল্পে সেই তো ব্যবহার করা।' নিশীথ বললে।

'আর তুমি "ইংরেজের-বাপ"কে তো চেনো?'

'সে আবার কে?'

'সিলেট থেকে বেতের চেয়ার ইত্যাদি এনে যে ফিরি করে বেড়ায়। সেদিন তার কাঁধের বোঝাটা মেম-সাহেব বেমালুম হালকা করে দিয়েছেন শুনলুম।' হরবিলাস চারদিকে চেয়ে গলাটা অপেক্ষাকৃত সংযত করে আনলো : 'আর জানো, সেদিন মতি সেকের বাড়ি থেকে কাঁঠাল-কাঠের ক'খানা পিঁড়ি পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছেন।'

'পিঁড়ি! পিঁড়ি দিয়ে তার কী হবে?' নিশীথ হাসবে না কাঁদবে ঠিক ঠাহর করতে পারলো না।

'কী আবার হবে! পছন্দ হলো, নিয়ে চললুম, কে আমাকে বাধা দেয়!' হরবিলাস একটা নাটুকে ভঙ্গি করলে : 'নিয়ে যেতে যে পারছে, এই তার নিয়ে-যাওয়ার বিবেক। যে-ই কিছু ঘুষ দিচ্ছে, টাকায় হোক বা জিনিসে হোক, মাপ হয়ে যাচ্ছে এক কিস্তি, অবিশ্যি মুখে-মুখে।' হরবিলাস সাঙ্কেতিক হাসলো : 'তুমি আমাদের গরিবুল্লা মুন্সিকে তো চেনো? সোহাগপুর মৌজায় একটা মোকররি জোত রাখে—ছ'টাকা সাড়ে ন'আনা খাজনা। চার বছর বাকি পড়েছে, রুজু হলো বলে মামলা, মেম-সাহেব একদিন নিজে এসে চড়াও হলেন। গরিবুল্লার বউ কাপড়ের পাড়ের সুতোর চমৎকার একখানা কাঁথা বুনছিলো, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আসছে শীতে ছেলেপিলেদের সম্বল—মেম-সাহেব বললেন, এক বছর

না-হয় তামাদি হয়ে যাবে খাজনা, ঐ কাঁথা তাঁর চাই, পাড়ের সুতোর কল্কা তাঁর ভারি চোখে ধরেছে। গরিবুল্লার বউয়ের সূঁচে আর সুতো পরানো হলো না—মেম-সাহেব ছোঁ মেরে কাঁথাখানা তুলে নিলেন।'

'কেন, কাঁথা সে গায়ে দেবে নাকি?' নিশীথ কষ্টে জিগগেস করলে।

'তেমনি আমার ফুলের গাছগুলি নিয়েও তিনি বাগানে পোঁতেননি। ইচ্ছে হলো, মুহূর্তের জন্য চোখে ভালো লাগলো, হাত বাড়ানো মাত্রই নিয়ে যেতে পারলেন—এতেই তো তাঁর যথেষ্ট সমর্থন। জিনিস—জিনিস তো বাড়লো গোটাকতক—কারু বাড়ি থেকে হাতির দাঁতের টুকরো, হরিণের শিঙ, পাথরের থালা, তামার টাট—যখন যেখানে যা পাওয়া যায়, বেতের ঝুড়ি, বাঁশের টুকিটাকি পর্যন্ত। নগদ যা মেলে তাতেই তাঁর লাভ।'

'এতে করে কোম্পানির খাজনা আদায় হচ্ছে?'

'মেম-সাহেবের তো গায়ে উঠছে গয়না। খাজনায় কী দরকার?'

'তার মানে?' নিশীথের কেমন সন্দেহ হলো।

'তার মানে তুমিও জানো, আমিও জানি, কোম্পানির হাত থেকে জমিদারিটা কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডস্-এ উঠে গেলো বলে।' হরবিলাস চুপি-চুপি বললে, 'এই তো সময় লুটে নেবার, লুফে নেবার। নইলে ধরো, যে-মহালের বার্ষিক খাজনা দুশো টাকা, দিয়ে যাক মেম-সাহেবকে আধ-ডজন সিল্কের শাড়ি, দুবছরের খাজনা মাপ। আর যার খাজনা দুটাকা, সে অন্তত এসে বড়ো দেখে একটা রুই মাছ দিয়ে যাক। এতে করে এই নিয়ম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মাস্টার, আগে শুধু গোমস্তাকেই নজর দিলে চলতো, এখন উপরন্তু মেম-সাহেবের নজরে পড়তে হচ্ছে।'

'তবে এই যে বললে মাপ হয়ে যাচ্ছে খাজনা?' নিশীথের সন্দেহ আরো ঘনিয়ে এলো।

'সেইখানেই তো বিশ্বাসঘাতকতা।' হরবিলাসের গলা উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো : 'আদালতে গিয়ে তামাদির আরজিগুলি যদি

দেখে আস, মাস্টার, কেউই বাদ পড়েনি। কোম্পানি ছাড়বে কেন? উপহারের উলটো পৃষ্ঠায় তো আর ওয়াশিল লেখা নেই।'

'তা হলে সত্যি-সত্যি অত্যাচার হচ্ছে বলো?'

'অত্যাচার!' হরবিলাস হাসলো : 'নইলে তোমার আসন্ন শীত-রাত্রের কাঁথাখানা কেউ নিয়ে যেতে পারে মনে করো?'

ধোঁয়ায় কালো, রুদ্ধশ্বাস কলকাতার বিস্মৃত এক সন্ধ্যার কথা নিশীথের মনে পড়লো। নবনীতাদের বাড়ি তখন ঝামাপুকুরে, অপরিচ্ছন্ন অপরিসরতার মধ্যে। নিশীথ ভারি পায়ে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, নবনীতা—(নবনীতাই তো তার নাম?) নিচে তাকে একটু দাঁড়িয়ে দিতে এসেছে। গায়ে হলদে রঙের ছোট একটুকরো র‍্যাপার, বাহু দুটি বহু কষ্টে ঢাকা পড়লেও কনুই দুটি ঢাকা পড়েনি—দরজার কাছে মিনতিময় নির্বাক চোখে আছে দাঁড়িয়ে। নিশীথ তখন মূর্তিমান ঔদ্ধত্য, গায়ে লংক্লথের পাতলা একটা পাঞ্জাবিই তখন যথেষ্ট লজ্জা। নিশীথ কী কথা বলবে, এতক্ষণ ধরে এত কথা বলে এখন আর কী কথাই বা বলা যায়, সেই দোদুল্যমান মুহূর্তে নবনীতা (নবনীতাই তো তার নাম!) তার কুণ্ঠিত, নরম, ঈষদুষ্ণ সেই র‍্যাপারটি হঠাৎ নিশীথের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এটা তুমি নাও, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।'

'একটা কাজ করে দিতে হবে, মাস্টার।' হরবিলাস নিশীথের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিলো।

'কি?' নিশীথ স্বপ্নোত্থিতের মতো বললে।

'তুমি হচ্ছ গিয়ে মাস্টার, ইংরিজিটা তোমার আসবে ভালো। একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

'কাকে?'

'হেড-আপিসে, কলকাতায়।'

'কি নিয়ে?'

'এই, ম্যানেজারের নামে একটা নালিশ।' দুরভিসন্ধিতে হরবিলাসের

মুখ রেখাঙ্কিত হয়ে উঠলো : 'সাক্ষী-সাবুদের কিছুই অভাব হবে না দেখো, আর এ তোমার উকিলের শেখানো সাক্ষী নয় যে প্রতি প্রশ্নে মাথা চুলকোবে।'

'বলো কী?' নিশীথের চুলের গোড়াগুলি কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ,' মত স্থির করে ফেলেছে হরবিলাস এমনি ভাবে বললে, 'ব্যাপারটা ওদের কানে ওঠা উচিত।'

নিশীথের মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেলো। বললে, 'চিঠিটা কার নামে যাবে?'

'বেনামিতে।'

'হাতের লেখা যদি ধরা পড়ে?'

'তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, মাস্টার।' হরবিলাস নিশীথের পিঠটা একবার ঠুকে দিলো : 'তুমি শুধু আমাকে খসড়া একটা করে দাও, কাউকে দিয়ে আমি নকল করিয়ে নেবো।'

'কোম্পানি বেনামি চিঠির কোনো দাম দেবে না।'

'দেবে হে দেবে, বড়ো-বড়ো কর্তাদের নামে বেনামিতেই চিঠি যায় হামেসা। সেখানে চিঠি কে লিখছে সেটা বিচার্য নয়, কী লিখেছে, কোথা থেকে! একেবারেই অসম্ভব শোনাবে না—এটা এমনি জ্বলজ্যান্ত ব্যাপার।' ছোট-ছোট শব্দে হরবিলাস একটুখানি হাসলো : 'এক্ষুনি-এক্ষুনি কোনো বিহিত না হোক, কোম্পানি হুঁসিয়ার হয়ে উঠবে রীতিমতো, যে-ঘরে ওদের বাসা, তার দেয়ালে সূক্ষ্ম কান পেতে থাকবে, আর এতেও যদি ওদের জিহ্বাটা সংযত না হয়, সে তখন কোম্পানির দায়িত্ব। আর কিছু নয়, বল্‌টা শুধু একবার গড়িয়ে দেয়া, মাস্টার।'

'ধরা পড়লে চাকরিটি তোমার যাবে, বিলাস।' নিশীথ নিথর একটা আতঙ্কের মধ্যে থেকে বললে।

'ঝড়ে বড়ো গাছই ভেঙে পড়ে, তৃণাগ্রের কিছুই হয় না।' হরবিলাস দার্শনিকের মতো বললে, 'আমলারা আমরা ঠিকই থাকবো, বদলাতে হয়

তো ম্যানেজার বদলাবে। আর সত্যি-সত্যি, আমাদের তো কোনো দোষ নেই।' হরবিলাস তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলে : 'চিঠিটা চোস্ত করে লিখে দাও, মাস্টার। মনে রেখো, খোদ সাহেবের নামে চিঠি।'

নিশীথ যেন একটা ঠান্ডা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নেমে এসেছে যেখানে সে সম্পূর্ণ একাকী ও একাকী বলেই নিরাপদ। বললে, 'ম্যানেজারের অভাব কী বিলাস যে লোভে এমন তাকে ছোট, কুৎসিত হয়ে যেতে হচ্ছে?'

'ম্যানেজারের তত দোষ নেই, আসল খাঁই হচ্ছে তাঁর মেম-সাহেবের। স্ত্রী তো নয়, শাদা হাতি। হাতির মাপের হাওদা জুটিয়ে ওঠাই মুশকিল।'

'কিন্তু তার মাইনেটাই তো যথেষ্ট মোটা।'

'তার চেয়েও মোটা তাঁর মেম-সাহেবটি। কুমিরের হাঁ মাস্টার, শামুক-গুগলিতে তার পেট ভরে না যে।'

'এ আমি ঠিক মেলাতে পাচ্ছি না।'

'সাধারণ সাংসারিকতার সঙ্গে। মাসান্ত মাইনেতেই যখন উদ্বৃত্তি, তখন আর লালসা কেন, যে-লালসা নিম্নগামী? এইখানটেতেই বিস্ময় আর বেদনা। কিন্তু,' হরবিলাস আবার দার্শনিক, গম্ভীর গলায় বললে, 'কিন্তু হাত বাড়ালেই যেখানে তুমি পেতে পারো, সেখানে হাত না-বাড়ানোটাই তোমার অমানুষিকতা, মাস্টার। শক্তির অপব্যবহারই যদি না হবে, তবে শক্তির ঐশ্বর্য কোথায়?'

'তা হলে ওদের তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?' নিশীথ সোজা জিগগেস করলে।

'পাগল! সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকা। তোমার সাহায্য না হলে চলবে না। বেশ একখানা জোরালো, ধারালো চিঠি।'

নিশীথ যেন আরো নেমে এলো, গভীরতরো অন্ধকারে, যে-অন্ধকার পাশবিক, হিংস্র আর প্রতীক্ষমান। নেমে এলো কৃষ্ণকায় বিশাল একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে।

'কী, থেমে গেলে যে মাস্টার?' হরবিলাস তার নিস্তব্ধতায় একটা ধাক্কা দিলে।

'ভাবছি।'

নিশীথ যেন একটা অন্ধকারের বুদ্বুদ, চারপাশে তার চেতনার অস্পষ্ট বিচ্ছুরণ।

'এর মধ্যে আর ভাবাভাবি কি? একটা শুধু চিঠি তো তোমাকে ড্র্যাফ্‌ট্‌ করে দিতে হবে।'

নিশীথ হাসলো : 'তাই তো একটু ভাবা দরকার, কি করে চিঠিটাকে বাঘের নখের মতো ধারালো করা যায়।'

হরবিলাসও হাসলো, তেমনি কাটা-কাটা ছোট-ছোট শব্দ।

বাড়ি আসতেই মিনতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যেন সে কি-একটা নতুন মজার গল্প পেয়েছে এমনি চমকিত ঔৎসুক্যে : 'তুমি সেই কেরামৎ ফকিরকে চেনো না?'

নিশীথ বিস্মিত বিরক্তির সুরে বললে, 'বাজে লোকের এতো নাম-ধামও তুমি মনে করে রাখতে পারো, মিনতি।'

'সেই যে ডিম ফিরি করে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি।'

'কী হয়েছে, মরে গেছে নাকি কলেরায়?'

'কী অলক্ষুণে সব কথা!' অসন্তোষে মিনতি মুখ ভার করলে : 'কেরামৎ ফকির কিনা, তাই তার বাঁচায় কোনো কেরামতি নেই।'

'যা বলেছ! কী করেছে সে?'

'আমাদের বাড়ি আজ ডিম বেচতে এসেছিলো।'

'কৃতার্থ করেছে।'

'তার কাছে শুনলুম, ম্যানেজারের কুঠিতে তার নাকি তিন কুড়ি ডিমের দাম বাকি। সাত আনা না সাড়ে-সাত আনা দাম।'

'তার মানে?'

'তার মানে দামটা ওকে দেয়নি আর-কি।'

'কারণ?'

'ম্যানেজার-সাহেবের বউ নাকি ওকে বলেছে : আমি কে জানিস? আমার কখনো দাম দিতে হয় না। অনেক কাঁদাকাটি নাকি করলো, কিন্তু মেম-সাহেব কানে তুললো না।'

'আর খালি-ঝুড়ি নিয়ে ও বাড়ি ফিরে এলো?'

'কী করবে তবে?'

'কী করবে! ছোটলোক, পাজি, ছুঁচো কোথাকার, আদালতে গিয়ে নালিশ করতে পারলো না?'

'ওর জন্যে আমার এমন দুঃখ করতে লাগলো।' ছায়া-পড়া নদীর জলের মতো ম্লান হয়ে এলো মিনতির মুখ।

'দুঃখে উথলে উঠে কী করলে জিগগেস করি?'

মিনতি শিশুর মতো নির্বোধ হেসে উঠলো : 'ওর থেকে এক কুড়ি ডিম রেখে দিলুম।'

'নগদ দাম দিয়ে?'

'তা ছাড়া আবার কী! এমন বেশি কী আর দাম!'

'না বেশি কী!' নিশীথ ঠাট্টায় হাসলো : 'ঐ সামান্য দাম দিতে না পারার মধ্যেও আশ্চর্য শক্তি আছে।'

'থাক, কিন্তু সুখ সমান।'

'মানে?'

'মানে দাম না দিয়ে মেম-সাহেব যা সুখ পেলেন, আমি তা দাম দিয়ে পেলুম।'

'দুর্বলের তা-ই সান্ত্বনা।' নিশীথ ঘরের মধ্যে চলে এলো : 'এ-সান্ত্বনা না থাকলে দুর্বলরা বাঁচতো না সংসারে।'

'নিশ্চয়।' মিনতি তাকে অনুসরণ করলো : 'মা'র কাছে শিশু যেমন দুর্বল, তোমার কাছে যেমন আমি, ঈশ্বরের কাছে যেমন পাপী আর অত্যাচারী—এর মাঝেও কম সৌন্দর্য নেই।'

'কিন্তু এ তোমাকে বলে রাখছি মিনু,' নিশীথ সহসা উত্তপ্ত হয়ে বললে, 'তোমার মেম-সাহেবকে নিখরচায় এতো নির্জলা সুখ আর ভোগ করতে হচ্ছে না।'

'তার মানে?' মিনতি ভুরু কুঁচকোলো।

'মানেটা জলের মতোই সোজা, যদি বুঝতে পারো।' নিশীথ গম্ভীর মুখে বললে, 'তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে গ্রামময়—তার গ্রাসটাকে এবার না বুজিয়ে ফেলতে হয় একেবারে।'

'এতে তোমারই যে অত্যন্ত উৎসাহ দেখছি!' মিনতির চোখে অদ্ভুত একটি বেদনার আলো দেখা দিলো।

'তা উৎসাহ একটু হওয়াই তো উচিত মনে করি।'

'পরের এতো সুখ বুঝি সহ্য হয় না?'

'কি করে হবে যদি তা পরের অশ্রু দিয়ে তৈরি হয়?'

'হোক, তাতে তোমার কি?' মিনতি রাগে ঝলসে উঠলো : 'তোমার তো সে কিছু অনিষ্ট করেনি। তোমার পাকা ধানে তো সে মই দিচ্ছে না।'

'না দিক, তবু শক্তিমত্ত অত্যাচারীর পতনে প্রাণে একটা কেমন আনন্দ হয়।'

মিনতি সহসা নিশীথের বাহুটা আঁকড়ে ধরলো, ভীরুতায় কী শীর্ণ তার আঙুল—তেমনি শীর্ণ, কম্প্র গলায় সে বললে, 'তুমি, তুমি এ-সবের মধ্যে যেতে পারবে না।'

'কেন বলো তো?' তার ভয় দেখে নিশীথ হাসলো।

'তোমার কিসের মাথা-ব্যথা, কেউ উঠুক বা পড়ুক, কেউ সুখী হোক বা না-হোক। তুমি থাকো তোমার নিজের কাজ নিয়ে।'

'মাস্টারিতে তুমি আমাকেও যে ছাড়িয়ে গেলে দেখছি।' নিশীথ উৎসুক হয়ে বললে, 'কিন্তু কী আমার নিজের কাজ জিগগেস করি? তোমার আঁচলটিতে এমনি মুখ ঢেকে বসে থাকা?'

'তা যে নয়, তা তো তুমি জানো।' মিনতি উষ্ণতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

'তবে?'

'যেখানে তুমি আছো, সেইখানে। তোমার ছোট স্কুলে, তোমার ছাত্রদের স্বপ্নময় বৃহত্তর ভবিষ্যতের মধ্যে।'

'এ যে তুমি ঠিক অবতারের মতো কথা বলছ, মিনতি।'

'হ্যাঁ, যা আপনা থেকে হবে, তাই হতে দাও। জোর করে তোমাকে আর দাঁড় বাইতে হবে না।' মিনতি যেন কোন আতঙ্কিত অন্ধকার নির্জনতায় তার পাশাপাশি এসে বসলো : 'সে তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। বরং—'

'বরং—'

'বরং সেই তোমার চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে মনে রেখো।'

'সে বাঁচিয়ে দিয়েছে?' আর্তনাদের মতো নিশীথ উঠলো চমকে।

'সে নিজে না হোক, ম্যানেজার-সাহেবই বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' মিনতির মুখ স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো : 'যে-চাকরিটা তোমার এক নিশ্বাসে চলে যেতে পারতো অনায়াসে।'

'গেলে যেতো, বয়ে যেতো।' নিশীথ গায়ের জোরে বললে।

'তেমনি যা যাবে, বয়েই যাবে। আমাদের কী দায় পড়েছে তাতে? আমাদের কী আসে-যায় অন্য লোক কে এলো আর গেলো আমাদের পাশ দিয়ে।' মিনতি আধো লজ্জায় ও আধো আনন্দে উছলে উঠে বললে, 'যতোক্ষণ আমরা আছি দুজনে, আমি আর তুমি।'

তাদের মাঝে তারপর নিঃশব্দ রাত নেমে এলো, কালো, কোমল সেই নিঃশব্দতা, যখন তারা রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে কোণের বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে বসেছে। ধারালো রেখায় বেঁকে গেছে নদীর ধারা, সেই ঘুমন্ত বঙ্কিমাটি এখান থেকে চোখে পড়ে। চেনা যায় না অন্ধকারে, কান পেতে থাকলে হাওয়ার মর্মরের সঙ্গে ঢেউয়ের মৃদুল ছলছলানি

একটু শোনা যায়। নদীর ওপারে খেয়াঘাটের ঘরে মিটমিট করছে বাতি, তা ছাড়া অন্ধকারের সমুদ্র, আগামী কালের প্রভাতের সীমান্ত পর্যন্ত যা প্রবাহিত। অনেক পর-পর খেয়ার নৌকোটা এ-পারে এসে ঠেকছে, আর মাঝি যাত্রীর সন্ধানে ডাক দিচ্ছে থেকে-থেকে, তার পরেই আবার যে-কে-সেই নিঃশব্দতা। একটা মাল-গাড়ি চলে গেলো বুঝি দূরের ইস্টিশান দিয়ে, তার চাকার অস্পষ্ট শব্দে রাত্রি যেন ঘুমের মধ্যে থেকে কথা কয়ে উঠলো। পুবের কিনার ঘেঁষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে আসছে, রোগশয্যা থেকে ক্লান্তকায় রূপসীর মতো, পাণ্ডুর আর বিষণ্ণ। কেউ জেগে নেই, চারদিকে শুধু অন্ধকারের বন্যা, আরো উঠে এলো সে তার নির্ভয় উন্মীলনে।

মিনতিও তার চেয়ারের পিঠে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে রাত্রির এই শান্তি, তার শরীরে রাত্রির এই রহস্য। নিশীথ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করলো না। এই নীরব মনোহীনতায় বা কতো স্বাদ।

সমস্ত পৃথিবী সুখী হোক!

[বারো]

নির্মল তার কোণের আপিস-ঘরে বসে কাজ করছে নির্মম, আর নবনীতা তার প্রাহ্নিক ভ্রমণ সেরে মোটরে এই বাড়ি ফিরে এলো।

কী নির্বাধ এই স্বাধীনতা, যে-রাস্তায় নিক ফেলে গরুর গাড়ি চলে তারই বুকের উপর দিয়ে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ধাবমান এই মাটির ধূমকেতু। হর্ন শুনলে আধ মাইল আগে থেকে লোকগুলি পথ ছেড়ে দেয়, যতক্ষণ না মোটরটা অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ তারা হাঁ করে দেখে আর ধুলো খায়। গরুগুলো ভয় পেয়ে মাঠের থেকে রাস্তায় আর রাস্তা থেকে মাঠে অন্ধের মতো ছিটকে পড়তে থাকে, সাধে কি আর

গর্ বলে ওদের! কলকাতার গর্গ্লো এর তুলনায় সভ্য, রাস্তায় এমন বিশ্রী ব্যবহার করে না। এক-এক সময় গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে সে মাঠের মধ্যে, যেখান থেকে কাছাকাছি কোনো চাষার বাড়ি হয়তো তার চোখে পড়লো। ঢ্কে পড়ে সে তাদের বাড়ির মধ্যে, উঠোন থেকে একেবারে দাওয়ায়, ভয় নেই, যে হাতে তার সোনার চুড়ি আর শাঁখা, সেই হাতেই তার একটা ছোট বন্দ্ক, বলিষ্ঠ হাতে বইতেও বা তাকে কত বিলাস!

চাষারা হয়তো মাঠে গেছে, হাল দিতে বা বীজ ছড়াতে বাড়ির মধ্যে বউ আর ছেলেপিলের দঙ্গল। কেউ বা চাল ঝাড়ছে কুলোয় করে, গোবরের তাল পাকিয়ে ঘ্ঁটে দিচ্ছে ঘাসের উপর, কেউ বা তেল মাখিয়ে ছেলে শ্কোতে দিয়েছে রোদ্দ্রে। যেমনি নবনীতা দাওয়ায় এসে উঠলো, কী অসম্ভব ভোজবাজি, বউ আর মেয়েগ্লো যে যেখানে পারলো ঊর্ধশ্বাসে ছ্টে পালালো, কুলো ফেলে, গোবর ফেলে, কোলের ছেলেকে পর্যন্ত ফেলে। ধ্লোয় পড়ে কোলের ছেলেগ্লো চ্যাঁচাতে শ্র্ করলো, ভয় পেয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে হাঁসগ্লো নেমে গেলো জলে, ম্রগিগ্লি অসম্ভব উড়াল দিয়ে উ'চু মাচার উপর গিয়ে বসলো। সামনে বাঁধা গর্গ্লো হয়তো ডাক দিয়ে উঠলো বাছ্রের সন্ধানে। দরজাগ্লো হাট করে খোলা, সমস্ত বাক্স-প্যাঁটরা, যা তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সব তারা যেন নির্বিবাদে তার হেপাজতে ছেড়ে দিয়েছে। যেন বর্গী এসেছে অসময়ে, সম্পত্তির চেয়ে প্রাণ বড়ো। ইচ্ছে করলে নবনীতা সব দ্হাতে ল্ট করে নিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু শ্ন্যে বন্দ্কের দ্টো ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর সে কিছ্ই করেনি। সে আওয়াজ তার ফাঁকা হাসির সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে আকাশে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নবনীতা তার বেশভূষাটা হালকা করছিলো দ্প্রের প্রতীক্ষায়, আর মনে-মনে হাসছিলো সেই সব মেয়ের চাষাড়ে

ব্যবহারে। আর যতক্ষণ না তার বেশ বদলানো হচ্ছে, একটা সিল্ক ছেড়ে আরেকটা সিল্কে, ততক্ষণ বাজতে দিয়েছে সে গ্রামোফোনটাকে। বিলিতি সুরের একটা করুণ বেহালা।

পরদার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আবুল হুসেন বললে, 'কালীপুর থেকে মাছ নিয়ে এসেছে।'

'এসেছে? যাই, দেখি গে।' বাজনাটা বন্ধ করে স্ট্র্যাপওয়ালা চটিটা দুপায়ে কুড়োতে-কুড়োতে নবনীতা বাইরে বেরিয়ে এলো।

হরবিলাসকেই মাছের সন্ধানে পাঠানো হয়েছিলো, শ্যামসায়রের হাওরটা যে ইজারা নিয়েছে। মহাশোল মাছ, যার স্বাদে এ-অঞ্চলটা লালায়িত।

'ক'টা দিয়েছে?' ভিতরের দিকের বারান্দায় চলে আসতে-আসতে নবনীতা জিগগেস করলে।

'দশটা।' হরবিলাস বিনয়ে গলে গিয়ে বললে।

সংখ্যাটা প্রথমে নবনীতার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু মাছের চেহারা দেখে সে নিজেকে কথঞ্চিৎ সম্মানিত বোধ করলে।

'এই ছ'টা মহাশোল আর এই চারটে কাতলা।'

মাছ তো নয় যেন কুমিরের বাচ্চা। দা-এ কুলোবে না, বোধহয় কুড়োল দিয়ে কাটতে হবে। গোটা চারেক কুলি লেগেছে বয়ে নিয়ে আসতে। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর গায়ের ঘাম মুছছে।

'দশটাই?' নবনীতা যেন থমকে দাঁড়ালো।

'আপনি চেয়েছেন,' হরবিলাস খোশামুদে গলায় বললে, 'ওর কম আর কি করে পাঠায়?'

'এত—এত মাছ দিয়ে কী হবে?'

নবনীতার কাছেও কোনো জিনিস বেশি হয়, তার আধিক্যবোধ আছে এটা হরবিলাসের কাছে নতুন শোনালো। হরবিলাস বললে, 'আপনি যা বলবেন।'

'আমাদের জন্যে একটা রেখে বাকি সব বিক্রি করে দিতে হবে আপনাকে।'

'বিক্রি?'

হরবিলাস যেন এতোটা কখনো আশা করেনি। সে ভেবেছিলো একটা দিয়ে দেয়া হবে বেয়ারাদের, মাছ যারা বয়ে এনেছে ঘাট থেকে, একটা আমলাদের মধ্যে, আর বাকিগুলি ভদ্রলোকদের পাড়ায়। সামান্যই তো মাছ, কিন্তু এরো মাঝে যে আয়ের সম্ভাব্যতা আছে তা তার বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতায়ও সে আয়ত্ত করতে পারেনি।

'তা ছাড়া আবার কী!' এক কথায় সায় দেয়নি বলে নবনীতা ভিতরে-ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠলো।

'কিন্তু আজ তো হাট-বার নয়, এত মাছ কি বিক্রি হবে?'

'বাজারে বিক্রি না হয়, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে-ঘুরে বিক্রি করতে হবে তা হলে। এদিকে শুনি তো মহাশোল মাছের নাম শুনে সবাইর জিভে জল গড়ায়!' হরবিলাসের প্রতিবাদে নবনীতার মেজাজ হঠাৎ চড়ে গেলো : 'আমি ও-সব কিছু জানি না, আপনাকে, হ্যাঁ, আমি বলছি, আপনাকেই এগুলোর বিক্রির বন্দোবস্ত করে দিতে হবে আজ। এতগুলো মাছ, কত কষ্ট করে হয়তো ধরেছে, বৃথায় আমি বয়ে যেতে দেবো না। জানি না কোথায় আপনি খদ্দের পাবেন, কিন্তু মাছের দাম আমার চাই।'

নবনীতা সরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কুলিদের মধ্যে থেকে কে একজন সাহস করে এগিয়ে এসে বললে, 'আমাদের বকশিশটা, মা-ঠাকরুণ।'

হরবিলাস তাড়াতাড়ি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আধখানা জিভ কাটলো। ফিসফিসিয়ে বললে, 'মা-ঠাকরুণ নয় মেমসাব।'

'আমাদের বকশিশটা, মেমসাব।' কুলিটার চাষাড়ে জিভে কথাটা ভালো সরলো না। নবনীতা এক সেকেণ্ড থামলো, হরবিলাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'মাছ-বিক্রির পয়সা থেকে ওদের দিয়ে দেবেন দু'আনা করে।'

কুলিদের মধ্যে চাপা প্রতিবাদের রোল পাকিয়ে উঠছিলো, কিন্তু সে-কথায় আর কে কান দেয়?

নবনীতা ঘরে ফিরে এসে রেকর্ডটা ফের ঘুরিয়ে দিলে, বাজনাটা অসমাপ্ত রয়েছে। কোনো জিনিস অসমাপ্ত থাকলে সে ভারি অস্বস্তি বোধ করে, মনটা বিদ্রোহ করে উঠতে চায়। যেমন রেকর্ডের বেলায়, হয় সেটাকে শেষ পর্যন্ত শুনবে নয় তো মেঝেতে ফেলে ভেঙে দেবে টুকরো-টুকরো করে।

তা ছাড়া এ-জোড়া দুল বদলে পরতে হবে আরেক সেট্, গায়ে-গায়ে গয়নার কিছু তারতম্য, চুলটা ছেড়ে দিতে হবে পিঠে, সর্বাঙ্গে স্নান করতে যাবার আগেকার শৈথিল্য, ভোরের রোদে নির্মল তাকে যে-পোশাকে দেখেছিলো তার থেকে এখন অন্যতরো বিচিত্রতায়।

কিন্তু সম্পূর্ণ রেকর্ডটা আজ আর বুঝি তার শোনা হলো না। বাইরে ছোট-খাটো একটা গোলমাল শোনা গেলো। খানিকটা কাতরানি আর ধমক।

নবনীতা চলে এলো বাইরে। দেখা গেলো আবুল হুসেন কাকে ধমকাচ্ছে আর কে-একটা চাষাড়ে লোক কী প্রার্থনা করছে করুণস্বরে।

'কে ওটা?' নবনীতা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলো।

তার মানে, আবুল হুসেনের ধমকটাই ন্যায্য, লোকটার কাতরানি কখনোই নয়।

আবুল হুসেন সবিনয়ে উত্তর করলো : 'জনাব আলি।'

'সেটা আবার কে?' নবনীতা কপালে ক'টা রেখা ফেললে।

'যার পাঁঠাটা কালকে কিচেন-গার্ডেনে ঢুকে পড়েছিলো, যেটাকে তারপর আপনার কথামতো বন্ধ করে রেখেছি আউট-হাউসে।'

'ও!' নবনীতা জনাব আলি-অভিহিত লোকটাকে লক্ষ্য করলে : 'তোমার পাঁঠা?'

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার।' লোকটার দুই চোখ অশ্রুতে ভরো-ভরো।

'ওটা আমার খেতে ঢুকে পড়ে ঢ্যাঁড়স-গুলো শেষ করে দিয়েছে। ওটাকে তাই আটকে রেখেছি।'

'হুজুর মা-বাপ।'

'ওটাকে তুমি পাবে না, ওটাকে রোস্ট বানাবো।'

ভীষণ একটা কিছু হবে জনাব আলি আঁচ করতে পারলো। মাটিতে বসে পড়ে বললে, 'আমি এই ধর্মঘরে এসে বসেছি, ওটাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। ও আমার ছেলের খেলার সাথী, ওকে হারিয়ে ছেলে আমার কাল থেকে কিছু মুখে তুলছে না, কেঁদে-কেঁদে ধুলোয় কেবল গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

নবনীতার বুকে যেন এসে বিঁধলো; বললে, 'দেবো ফিরিয়ে তোমার পাঁঠা, কিন্তু জরিমানা দাও আগে।'

'জরিমানা?' জনাব আলি যেন মাটিতে বসে পড়লো।

'নয় তো ওটাকে আমি অমনি ছেড়ে দেবো নাকি ভেবেছ?' নবনীতা রুক্ষ গলায় বললে, 'এ-মুল্লুকে ঢ্যাঁড়স পাওয়া যায় না, তায় পাঁঠা পাঠিয়ে আমার এমন সাধের খেতটা তুমি সাবাড় করে দিলে, আর আমি তোমাকে কোঁচড় ভরে চিঁড়ে-মুড়কি খেতে দেবো, না?'

'একশোবার কসুর হয়েছে ধর্মাবতার,' জনাব আলি মাটিতে হাত চাপড়াতে লাগলো: 'এ-যাত্রায় ওকে রেহাই দিন। আমি এবার থেকে ওকে সারা দিনমান খুঁটিতে বেঁধে রাখবো।'

'তাতে তো আমার খেতটা আবার তাজা হয়ে গজাবে কি না! যা বলেছি বাপু, জরিমানা না দিলে ওকে আর তুমি ফিরে পাচ্ছো না।' তারপর আবুল হুসেনের দিকে তাকিয়ে: 'ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দাও দিকি।'

আবুল হুসেনের হাতে ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করবার আগেই জনাব আলি ট্যাঁকে হাত রেখে বললে, 'কত দিতে হবে?'

'এক আধুলি।' নবনীতার স্বর কাঠিন্যে নিটোল।

'আট আনা!' জনাব মুহূর্তে যেন হলদে, ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। মূঢ়ের মতো বললে, 'এর চেয়ে খোঁয়াড়ে দিলে যে ছ'পয়সায় ছাড়িয়ে আনতে পারতাম।'

'আবুল হুসেন, ফিরিয়ে দিয়ো না এর পাঁঠা।' নবনীতা বিশাল একটা ঘাই মেরে ভিতরে অন্তর্ধান করলে।

'দিচ্ছি, দিচ্ছি তোমার জরিমানা।'

নবনীতা ফিরলো।

জনাব আলি তখন তার ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করে গুনতে শুরু করেছে। আনিতে আর পয়সায় আট আনা সে রাখলো এনে সিঁড়ির উপর। আবুল হুসেন সেগুলো কুড়িয়ে নবনীতার প্রসারিত করতলের উপর ছেড়ে দিলে।

'দাও, ওটাকে এবার ছেড়ে দাও।'

নবনীতা ভিতরে যেতে-যেতে শুনলো আবুল হুসেন বলছে : 'কিন্তু সাবধান, আরেকবার যদি এসে ঢোকে, তবে ওর ছালটাও নিয়ে যেতে পারবে না। তবে বিশেষ কাঁদাকাটা করো তো এক বাটি গরম ঝোল না-হয় খেতে দেয়া যাবে।'

জনাব আলি পাঁঠাটাকে কোলে করে তার মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে পথে নেমে এলো।

নবনীতা ঘরে ফিরে এসে আবার গ্রামোফোন দিয়েছে, আবার গোড়া থেকে। এবার নিজেকে হেলিয়ে দিয়েছে একটা সোফায়, আধখানা; একটা হাঁটু দুমড়ানো, মেঝের উপর আরেকটা পা আপ্রান্ত প্রসারিত, আঙুলের ডগায় চটিটা খুব আলগা করে নাচাচ্ছে। গুনগুনিয়ে উঠেছে গ্রামো-ফোনের সঙ্গে। হাতে প্রকাণ্ড একটা বিলিতি ম্যাগাজিন, শুয়ে-শুয়ে দুই হাতে তাকে সামলানো যাচ্ছে না। ভারি চুলগুলি কতক-বা গালের দুপাশে ফেঁপে রয়েছে, কতক-বা এসেছে গলার ধার দিয়ে নেমে। জামার যে-হাতা কাঁধের সূক্ষ্ম সীমা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে তাতে চওড়া শাদা

সিল্কের লেস হাওয়ায় কাঁপছে মৃদু-মৃদু। কাগজের নিচেকার অক্ষর-গুলো অনুধাবন করবার জন্যে তার চিবুকটা এসেছে নেমে, ভারি হয়ে, আর চোখ যখন উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে গলার আভাসে জেগে উঠছে বা শঙ্খের উপমা। সমস্ত মিলে সে যেন তুষারের ফুল, ঠান্ডা আর শাদা। সমস্ত তার শরীরে নিটোল পরিতৃপ্তি।

পরদার আড়ালে আবুল হুসেনের আবার অস্পষ্ট আবির্ভাব হলো।

'কি রে?' নবনীতা এতোটুকুও নড়লো না।

'সেই পালকি-বেয়ারাটা এসেছে, মেমসাব।'

'কোনটা?' বিস্ফারিত চোখে পালকগুলি ঘন-ঘন নাড়তে-নাড়তে নবনীতা অবাক হয়ে কি ভাবলে।

'সেই হাউসখালির বাজারের কাছে এসে মোটর চলবার আর রাস্তা ছিল না, তখন নাকি ওর পালকি করেছিলেন—'

'ও, হ্যাঁ।' নবনীতা আলস্যে একটা পৃষ্ঠা উলটোলো : 'কী হয়েছে তাতে?'

'ভাড়া চায়।'

'ভাড়া চায়?' নবনীতা ভুরু কুঁচকোলো : 'ও আমাদের প্রজা নয়?'

'ও-ও তো তাই বলছিলো।'

'বলছিলো তো ভাড়া চায় কোন আক্কেলে?'

সেটা আবুল হুসেনের কাছেও প্রাঞ্জল নয়। বললে, 'শুনছে না।'

'যাতে তবে শোনে তার ব্যবস্থা করো গে।' নবনীতা যেন সোফার আলস্যে আরো ডুবে গেলো : 'ওর পালকি চড়ে কী নৈসর্গিক সুখই না আমাকে ভোগ করতে হয়েছে! না পারা যায় মাথা খাড়া রেখে বসতে, না পারা যায় পা মেলে দিয়ে নিজেকে ছড়াতে। হতচ্ছাড়া দেশের রাস্তা-ঘাট ভালো নয় বলেই তো ও কাঠের সিন্দুকটায় গিয়ে হেঁট হয়ে বসতে হয়েছিলো। নইলে রাস্তাগুলোর ভদ্রলোকের মতো চেহারা হলে মোটরেই তো যেতে পারতুম, কার দায় পড়েছিলো গাঁ থেকে দুপুরবেলা ওদের

ডেকে আনতে।' তারপর দুলে একটু কাত হয়ে : 'রাস্তা খারাপ তো আমি করবো কী? তাই বলে খাজনা-পাতি আদায় হবে না নাকি?' তারপর এক ঝটকায় উঠে পড়ে বাজনাটা সে বন্ধ করে দিলে। এবং সেই আকস্মিক স্তব্ধতায় তার হুকুমটা প্রচণ্ড স্পষ্ট শোনালো : 'কথাটা ওকে সোজা করে বুঝিয়ে দাও গে, যাও।'

আবুল হুসেনের বুঝতে অবিশ্যি আর দেরি হলো না।

নবনীতা উলটো পিঠে পিন ঘুরিয়ে দিয়ে আরেকটা সোফায় গিয়ে বসলো। এবারের ভঙ্গিটা আলস্যে ততো শিথিল নয়, একটু বা উচ্চকিত ও অসহিষ্ণু।

খানিক পর, বাজনাটা যখন থামো-থামো, নির্মল এসে সে-ঘরে ঢুকলো, যেন খোলা প্রান্তরে; তার কাজের অরণ্য থেকে। নবনীতার যেমন সব সময়ে সিল্ক, নির্মলের তেমনি স্যুট, কখনো বা সর্টস্। নির্মল এসে দাঁড়ালো তার বলিষ্ঠ উপস্থিতিতে। তাকে দেখে নবনীতা একটু হাসলো, গভীর অনুচ্চারিত তৃপ্তিতে। স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ, দৃপ্ত তার শরীর, বলিষ্ঠ রেখায় তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ, গর্বিত অনমনীয়তা। কী সুন্দর তাকে দেখতে, যেন ধূসর সমুদ্রের তলা থেকে সূর্য এলো উঠে। নির্মল তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার মতো তীব্র, প্রসুপ্ত পাথরের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ। তাই তাকে তার এত অচেনা মনে হয়, অথচ এত পরিষ্কার। তাই তাকে সে এত ভালোবাসে, সব সময়ে সে নিজেতে এমন পর্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ, তার কাজে আর চেষ্টায়, তার সংকল্পে আর সংগ্রামে, তার চিরন্তন ঊর্ধগামিতায়। কখনো সে থেমে নেই এক জায়গায়, শৃঙ্গ থেকে উঠে চলেছে শৃঙ্গে। এত শ্রম করেও এত শক্তির সে অধিকারী, এত ব্যয় করেও যার এতটুকু কখনো ক্ষয় পায় না। যেন কোথাও তার শেষ নেই, তাকে জানবার আর পাবার। ঘুমের থেকে জেগে উঠে যেমন অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে, যে, পৃথিবী এখনো বেঁচে আছে, তেমনি নির্মলের মাঝে তার নতুন জাগরণ, নতুন বিস্ময়। ডিমের

খোলসের থেকে পাখির মুক্তির মতো। তাকে তাই সে ভালোবাসে, যেন তার আত্মার অন্ধকার গহ্বর থেকে বেদনার নির্ঝর পড়ছে ঝরে তার শরীরের সমস্ত তন্তুতে। যেন একটা দুর্দান্ত ঝড় তাকে সবলে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে আকাশের নীল নির্মুক্ততায়। কোথাও ভাবের আবছায়া নেই, চিত্তের সেই অসামঞ্জস্য, নির্ভয় নিয়ে এসেছে তাকে ক্ষুরধার বুদ্ধির স্পষ্টতায়, পরস্পরকে স্বকীয় জায়গা করে দেবার সহজ সহানুভূতিতে। দুজনে এত আসক্ত থেকেও নির্লিপ্ত, কোষের ভিতরে যেমন তলোয়ার। তার উপস্থিতিতে সে যখন গিয়ে দাঁড়ায়, যেন জ্ঞান-বৃক্ষের তলায় ঈভ এসে দাঁড়িয়েছে : কত সুন্দর লাগে পৃথিবী, কত বিচিত্র লাগে জীবন, কত অফুরন্ত মনে হয় নিজেকে।

নির্মল প্রসন্ন মুখে বললে, 'ইচ্ছে করলে কলকাতা যেতে পারো, নীতা।'

নীতা, নবনীতা। আগে-বা নবনী ছিলো, যে-অর্থের সঙ্গে তার আর সঙ্গতি নেই, এখন সে নীতা, নবনীতা। নতুন করে যাকে আনা হয়েছে।

বাজনাটা বন্ধ করে ভুরুর টানে স্নিগ্ধ বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়ে নবনীতা বললে, 'সেখানে কী?'

'বদলি হতে পারবো, যদি চাও। একশো টাকার একটা লিফ্‌ট্‌ হয়।'

'একশো টাকা।' নবনীতা নিচের ঠোঁটটা একটু ভারি করলো : 'ওতে কী হবে?'

'তা ঠিক। তেমনি শুধু বাড়ি-ভাড়াতেই যাবে দুশো টাকা বেরিয়ে।'

'কম করে তা-ও।'

'তবে তুমি রাজধানী যাবার জন্যে মাঝে-মাঝে উতলা হও কি না।'

'হই। কিন্তু কলকাতা শুধু ব্যয়ের জায়গা, বাসের জায়গা নয়।'

'বেশ, আছে যখন, ব্যয় করবে। ব্যয় করাতেই তো বাঁচা।' নির্মল ছোট, নিচু একটা কৌচে গিয়ে বসলো।

'কিন্তু আয়ের চেহারাটাও তো সেখানে এমন পুরুষ্টু থাকবে না।'

নবনীতা কুটিল একটু হাসলো : 'উপবাসে তখন যে সেটা নিতান্ত কাহিল হয়ে এসেছে।'

'সেটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। তবু জমকালো কলকাতায় গিয়ে থাকা।' নির্মল শিশুর মতো স্ফূর্তিবাজ গলায় বললে, 'তার কালো পিচের দীর্ঘ নিঃশব্দ রাস্তা দিয়ে মোটর চালানো—'

'কত হাজার লোকই তো চলছে। নির্মল আর নবনীতাকে কে চিনবে আলাদা করে?'

'তবু এই বুনো মফস্বল, জীবন্ত একটা নরক বলতে পারো।'

'তা পারো। কিন্তু স্বর্গের চাকর হওয়ার চেয়ে নরকের রাজা হওয়া অনেক বেশি আমি পছন্দ করি। স্বর্গে অনেক বেশি ভিড়।' নবনীতা কথার মধ্যে হাসির হীরে ছিটিয়ে দিতে লাগলো : 'অনেক বেশি গোলমাল। সেটাতে বিন্দুমাত্র অসাধারণতা নেই। সেইখানে মোটরে যে চলেছ সেটা নিতান্তই গ্রাম্যতা মনে হবে, আর এখানে কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি ছোটে আর সমস্ত গ্রাম যখন নির্নিমেষে সে-গতির ঝড় দেখে, তখনই সেটা বিশেষ করে একটা উচ্চণ্ড বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তোমাকে সবাই লক্ষ্য করে, তোমার দিকে আঙুল দেখায়, দেখলে ভয়ে সরে যেতে পথ পায় না।'

'কিন্তু ওখানে কত য়্যামিনিটি, কত সুবিধে।'

'তেমনি কত প্রতিযোগিতা। সে-ব্যয়ের কোনো মর্যাদা নেই, যার পিছনে নেই প্রকাণ্ড একটা বাহোবা—সে তোমার দানেই হোক আর ব্যসনেই হোক। সেখানে কে তোমাকে বাহোবা দেবে, যেখানে সবাই ব্যয়ের জন্যেই পাগল! আর, ধরো, যারা ব্যয় করতে অক্ষম, তাদেরও আর চোখ টাটায় না সেখানে, কেননা তোমার চেয়েও ঢের অপব্যয়ী তারা দেখেছে।'

'তবে আমরা সব ব্যয় করি পরের চোখে কেবল প্রশংসা কুড়োবার জন্যে?'

'নিশ্চয়। আমরা যে সাজি, কেন? পরের তুলনায় নিজেকে সুন্দর করে দেখাতে। দেখাতে, আমাদের রূপের চেয়েও আরো একটা বড়ো জিনিস আছে, সেটা রূপো। আমরা যে ব্যয় করি, কেন? পরের যে নেই সেটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই বলে। এবং সেই দেখানোতেই আমাদের সুখ।'

'মোট কথা, তুমি তা হলে কলকাতায় যেতে চাও না?' নির্মল প্রশংসমান হাসিমুখে বললে।

'কেনই বা যাবো আমার এই শক্তি আর তার ঐশ্বর্য ছেড়ে? শুধু অর্থে কী হয় যদি তার ভোগের পিছনে অন্য লোকের তীব্র একটা জ্বালা না অনুভব করতে পারি?' নবনীতা কথা বলার উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো: 'কী করে আমার সম্পদ নিয়ে তবে সুখী হই বলো, যদি না আমাকে কেউ প্রবল ঈর্ষা করে, যদি না কেউ আমাকে কদর্য ঘৃণা করে, যদি না কেউ আমাকে অভিশাপ দেয় প্রচণ্ড?' নবনীতা শব্দ করে হেসে উঠলো: 'তা হলে তবে সে-সুখের স্বাদ কই? তবে তার সঙ্গে তো তপোবনের সুখের কোনো তফাত নেই। কলকাতায় আমি তো একটা দলে গিয়ে পড়বো, পাঁচজনের মধ্যে একজন, কিন্তু এখানে আমি একা, একচ্ছত্র।' নবনীতা মাথার একটা গর্বিত ভঙ্গি করলে, বললে: 'ও-সব তুমি মনেও স্থান দিয়ো না, কলকাতায় যাওয়া সব দিক দিয়েই ক্ষতি।'

নির্মল স্মিত মুখে একবাক্যে সায় দিলে: 'ও একটা কথার কথা বলছিলুম মাত্র। গেলে যাওয়া যেতো, এই পর্যন্ত।'

'তা তো যাচ্ছিই মাঝে-মাঝে, কিন্তু চিরকালের মতো থাকা, এই শক্তি ও তার অপব্যবহার করবার অধিকার হারিয়ে! অসম্ভব। তা হলে আমি আর বাঁচলুম কোথায়?' নবনীতা সোফায় হেলান দিলে।

'বা, ও তো ছেড়ে দিলাম।'

'আমি তা জানি।' নবনীতা হাসলো: 'তুমি যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসো।' এর জন্যেই নির্মলকে তার ভালো লাগে, সে তাকে

বুঝেছে, তার অন্যতরো দৃষ্টি-কোণ। তাকে সে আচ্ছন্ন করেনি, বুদ্ধিতে অসম্পৃক্ত রেখেছে। এরি জন্যে নির্মলের ব্যক্তিত্বে সে অভিভূত।

বুঝেছে, হ্যাঁ, নবনীতা ম্যামনের উপাসিকা, প্রচণ্ড ধন-দানবের। ঋণ, রোগ আর আগুন, কোথাও এদের শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই নবনীতার পিপাসার। সে সুখী হবে, সুখী হওয়াতেই তার মহত্ত্ব, নিজেকে অস্বীকার বা বঞ্চিত করে নয়, পরিপূর্ণ সম্প্রসারিত করে, যতোদূর তার হাতের নাগাল গিয়ে পোঁছয়। বড়ো-বড়ো তত্ত্ব-কথা তাকে আর ভোলায় না, রূপকের চেয়ে রূপোকেই সে বেশি পছন্দ করে। বলতে লজ্জা কি, সে আরো পেতে চায়, আরো, সমৃদ্ধি আর শক্তি, ঔজ্জ্বল্য আর বিচিত্রতা। এই লোভের মধ্যেও একটা বিরাট কল্পনা আছে। কে না চায় যদি তা সে পেতে পারতো হাত বাড়ালেই? আর পেতেই যখন হবে, তখন হাতটা ভিক্ষুকের মতো না দস্যুর মতো বাড়াতে হবে, তা নিয়ে গবেষণা করায় আর কৃতিত্ব নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর নির্মল ক্ষণকালিক বিশ্রামের ফাঁকে নবনীতাকে বললে, 'এ-জায়গা ছাড়বার আরেকটা কারণ আমি তোমাকে দিতে পারি।'

'কি?' পুরোনো কথায় ফের ফিরে যেতে নবনীতার আপত্তি দেখা গেলো।

'এখানে আমার নামে একটা ঘোঁট পাকানো হচ্ছে টের পাচ্ছি।'

কথাটা নবনীতা যেন বোঝেনি, তার মুখে সেই নিশ্চিন্ত শূন্যতা।

'আমার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের ধুয়ো তুলে দেয়া।' হাসিমুখ, অথচ নির্মল ভারি গলায় বললে।

'তার মানে?'

'কিছু শত্রু সৃষ্টি করেছি আর-কি।'

'শত্রু?'

'হ্যাঁ, আর তার দলপতি শুনতে পাচ্ছি নাকি সেই মাস্টার।'

'মাস্টার, কোন মাস্টার?' নবনীতা খাড়া হয়ে উঠে বসলো।

'বা, তাকে তুমি দেখনি?'

লুকোতে যাওয়া বৃথা, নির্মলের চোখে এমন প্রসন্ন আলো পড়েছে ছড়িয়ে। নবনীতা উঁচু গলায় হেসে উঠলো : 'সেই যে একদিন হাফ-সার্ট গায়ে দিয়ে মালকোঁচা মেরে সাইকেল চড়ে এসেছিলো এখানে?' হাসতে-হাসতে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে নিজের কোলের উপর লুটিয়ে পড়লো : 'উঃ, সে কী ইডিয়টের মতো চেহারা!'

'তার চাকরিটা তো তখনই দিচ্ছিলুম খতম করে,' নির্মলের গলায় অনুতাপের ঝাঁজ পাওয়া গেলো : 'তোমার কী যে মায়া পড়লো হঠাৎ, নিতে দিলে না।'

'কেননা ওর চাকরি নিয়ে আমাদের আয় বাড়তো না, সে-জায়গায় আরেকটা মাস্টারই ফের রাখতে হতো।'

'তবু বিষদাঁত গোড়াতেই ভেঙে দেয়া উচিত।'

'কেন, কী করেছে সে?' নিঃশব্দ রাগে নবনীতার সমস্ত মুখ গেলো ভরে।

'কী আবার করবে—করবার সাধ্য কী ওর?' নির্মল কঠিন একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করলে।

'তবে?'

'এই, আমার বিরুদ্ধে এখানে-সেখানে বলাবলি করছে নাকি।'

'তোমাকে কে বললে?'

'এই, হরবিলাস বলছিলো।'

'কী?'

'যে, মাস্টার নাকি আমার নামে যার-তার কাছে লাগাচ্ছে। আমি ঘুষ নিই, প্রজা ঠ্যাঙাই—এই সব।'

'এই কথা?' নবনীতা কুপিত মুখের উপর স্নিগ্ধ হাসি ঢেলে দিলো : 'তাতে তুমি ভয় পেয়ে গেছ নাকি?'

'ভয়—আমি ভয় পাবো?'

'কে একটা কোথাকার মাস্টার কী বলেছে না-বলেছে তাই আবার তুমি ঘাড় বাড়িয়ে কানে তোলো!'

'কিন্তু লোকটার একবার আস্পর্ধার কথা ভাবো, নীতা।' নির্মল ঘরে পাইচারি করতে-করতে বললে, 'ওর চাকরি বাঁচিয়ে দিলুম, আর ওর এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতা নেই।'

'তা হলে তো মাস্টার না হয়ে মানুষই হতো।' নবনীতা হেসে উঠলো।

'যাই বলো, চাকরিটা না নিয়ে ওর ভালো করিনি।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে।'

'ওকে আমি ইচ্ছে করলে পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় ছারপোকার মতো মেরে ফেলতে পারি।'

'একশো বার।' নবনীতা জোর গলায় বললে, 'কিন্তু মাস্টারের কথা তুমি একেবারেই আমোলে আনছ কেন? হোক না শত্রু, শত্রু না থাকলে বেঁচেই বা সুখ কোথায়?'

'ও তো ভারি একটা শত্রু!'

'তবেই তো দেখছ ওকে বিন্দুমাত্রও ভয় করবার নেই। বরং,' নবনীতা অবজ্ঞার সঙ্গে করুণা মিশিয়ে বললে, 'ওরই বরং ভাগ্য যে, তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে ওর সাধ যায়। মন্দ বলোনি শেষ পর্যন্ত, একটা পুঁচকে মাস্টারের ভয়ে কিনা আমাদের কলকাতা পালাতে হবে।'

কথাটা এতোটা জাঁকালো করে বলে ফেলে নির্মলের এখন খানিকটা লজ্জা করতে লাগলো।

নরম, নীল হয়ে এসেছে সন্ধ্যা, নবনীতা স্বামীকে নিয়ে নদীতে বেরুলো মস্ত রাজহংসের মতো তার শাদা ময়ূরপঙ্খীতে, গায়ে-গায়ে যার রুপোলী ঝিনুক বসানো। অনেক দিন পর তার জলের উপর ভারি বেড়াতে ইচ্ছে করলো, নিঃশব্দে, ভারি জলের উপর দিয়ে। আরো আগে বেরিয়ে নির্মল সঙ্গে একটা বন্দুক নিতে চেয়েছিলো, নবনীতা রাজী

হয়নি। এই ভারি চমৎকার, জুতো খুলে নদীর জলে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে বসে থাকা। স্রোতের টানে ভেসে চলেছে কচুরি-পানার ছোট-ছোট কয়েকটি দল, রঙচঙে পাল উড়িয়ে হালকা কতো-গুলি পানসি, বাঁশের আঁটি বেঁধে লগি না ঠেলে অলস কোনো বেপারি চলেছে স্রোতের টানে। পা দিয়ে জল ঘেঁটে-ঘেঁটে নবনীতা ছোট-ছোট শব্দ করতে লাগলো। নির্মল যে দাঁড় টানছে বসে এ-ই বা তার ভালো লাগছে কতো—সার্টের ভিতর থেকে তার বাহু, কাঁধ ও বুকের পাশ দুটোর পেশী উঠছে ফুলে। সে যেন তাকে কতোদূর টেনে নিয়ে চলেছে। তার দাঁড়ের আঘাতে জলের আলোড়নের মতো বুক তার কেঁপে উঠছে, আনন্দে, নিঃশব্দ, ভারি জল।

অনেক সব তির্যক বাঁক নিতে লাগলো নদী। আকাশ কালিমায় কোমল হয়ে এলো। নদীর পাড়গুলো পরিত্যক্ত, জেলেরা জাল গুটিয়ে নিয়েছে, প্রান্তবর্তিণীদের কলস আর খালি নেই, দুয়েকটা করে জোনাকি দেখা দিয়েছে মৃদু-মৃদু। ট্রে-তে করে বাবুর্চি চা দিয়ে গেলো। নবনীতা বললে, 'এবার ওটা ফেলে চলে এসো, চা তৈরি।'

চা খেতে-খেতে নির্মল চারদিক চেয়ে তন্ময়ের মতো বললে, 'এই নদী, জলের উপরে অন্ধকার, দূরে চাষার ঘরে আলো, সব দেখে কেমন ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়।'

'মনে পড়ে, না?' নবনীতা অদ্ভুত হাসলো, চারদিকে চেয়ে সে বললে, 'আচ্ছা, ছেলেবেলায় তুমি কাউকে কোনোদিন ভালোবেসেছিলে?'

'ছেলেবেলায়?'

'না, ধরো, এই বড়ো হয়েই। যখন ভালোবেসেছিলে, তখন নিশ্চয় সেটা ছেলেবেলাই বলতে পারো।'

'কই,' আকাশে চোখ তুলে নির্মল খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলে : 'কই, মনে পড়ে না।'

'কোনো মেয়েকেই ভালোবাসোনি?'

'তোমাকে ছাড়া তো?'

'নিশ্চয়।'

'উঁহু।' নির্মল একটা নঙর্থক শব্দ করলো।

'বলো কি? তোমার জীবনের এতগুলি বৎসরের মধ্যে কোনো মেয়েরই পদচিহ্ন পড়েনি?'

'সে-ব্যাপারে আমার দুর্ভাগ্য আজকের সৌভাগ্যের মতোই অসীম, নীতা।'

'আশ্চর্য।'

'চাকরি পাবার পর কয়েকটা মেয়ে তাদের মায়ের থুতে ভালোবাসতে চেয়েছিলো নাকি,' নির্মল সশব্দে উঠলো হেসে : 'কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেও প্রতীক্ষা করতে পারলুম না— তুমি এসে পড়লে। আর এখানে-সেখানে কখনো-সখনো যা-বা দু-এক-জনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলুম, তা, মনে কোনো তারা রেখাপাত করতে পারেনি। তাদের কেমন যেন বড্ড বোকা-বোকা মনে হতো, মনে হতো, ওদের সব সময়েই যেন ধারণা, ওদের প্রেমে পড়বার জন্যে সমস্ত পুরুষজাতটাই ঘুরঘুর করছে। তাই অলিতে-গলিতে আর ঘেঁষিনি, সোজা রাজপথে বেরিয়ে এসেছি।' বলে নির্মল নবনীতার বাঁ মণিবন্ধটা জোরে চেপে ধরলো।

নবনীতা কোনো কথা বললে না। কাটলো খানিকক্ষণ চুপচাপ। জলের উপর থেকে-থেকে বৈঠার শব্দ। নির্মল শান্ত হয়তো বা সস্নেহ গলায় জিগগেস করলে : 'আর তুমি? তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলে?'

'তোমার কী মনে হয়?' নবনীতার চোখে বেদনার শুভ্র একটি শিখা জ্বলে উঠলো।

'বিশেষ কিছুই মনে হয় না।'

'যদি বলি, বেসেছিলুম?' কৌতুকে নবনীতা অস্ফুট একটু হাসলো।

'মোটেই বিস্মিত হব না।'

'কেন হবে না?'

'কেননা সেটা এমন কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়।'

'কিন্তু শুনলে একটু ক্ষুণ্ণও তো হতে পারো।'

'বা রে, ক্ষুণ্ণ হতে যাবো কেন?' নির্মল অসঙ্কোচে হাসিমুখে বললে, 'আমার তো বরং মনে হয় ওটা মনের ডিসিপ্লিনের পক্ষে দরকারি, গ্রীক ক্যাথারসিসের মতো। কী বলো?'

'কিন্তু সেই মেয়েকে কি পরে ভালো লাগে?' নবনীতা স্বামীর সামীপ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

'সে-মেয়ের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তোমাকে যে কী অসীম ভালো লাগে, সে-ই কথাই শুধু বলতে পারি। যার অতীত বলে কিছু আছে, সেই বর্তমানে সত্যিকারের সাথী হতে পারে, নীতা, কেননা একমাত্র সেই তখন বাছতে পারে, বুঝতে পারে, কোনটা খোসা আর কোনটা শাঁস!'

নবনীতা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'এবার ফেরা যাক, অনেক দূর এসে পড়েছি।'

নৌকো বাড়িমুখো ফিরে চললো।

নির্মল বললে, 'প্রেমিকার থেকে যে স্ত্রী, সে শুধু স্বাভাবিক একটা পরিণতি, ক্লান্তিতে থেমে যাওয়া, খানিকটা কর্তব্য আর নিষ্ঠা; কিন্তু স্ত্রীর থেকে যে প্রেমিকা সেইখানেই সত্যিকারের কল্পনার রোমাঞ্চ— শূন্য থেকে আকাশ সৃষ্টি করে তোলা। এখানে তুমি আরম্ভ করো নিষ্ঠুর কর্তব্য থেকে, কিন্তু এসে পড়ো নিবিড় ভালোবাসায়, নিবিড় ভালোবাসা থেকে বিস্বাদ কর্তব্যে নেমে আসো না। এটা তোমার পরিণতি নয়, এটা তোমার আবিষ্কার। তাই তোমাকে আমি পাইনি, তোমাকে আমি লাভ করেছি, নীতা।'

নবনীতা এ-আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দ্রুত গলায় বললে, 'ঐ দ্যাখ, নারকেল-বোঝাই একটা নৌকো যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঘাটে লাগিয়ে রেখে নৌকো থেকেই ওরা পাইকারি ব্যবসা করে।'

'চলো না, দেখি না কেমন নারকেল।' নবনীতা ছেলেমানুষের মতো বললে, 'কতদিন নারকেল-কোরা দিয়ে মুড়ি খাইনি।'

'ও আবার এমন কি খাদ্য!'

'তুমি হঠাৎ আজ ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিলে কিনা।' নবনীতা অদ্ভুত হেসে উঠলো। তারপর উদ্দীপ্ত গলায় বললে, 'তাড়াতাড়ি বেয়ে চলো, নৌকোটা বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছে।'

চায়ের পেয়ালা-পিরিচগুলো ঝনঝনিয়ে সরিয়ে দিয়ে নির্মল দাঁড়ে গিয়ে বসলো।

[তেরো]

এত দিন তবু একরকম যাচ্ছিলো, কিন্তু এ বুঝি আর সহ্য করা যায় না। নিশীথ আপাদ-মস্তক ক্ষেপে উঠলো।

গঙ্গাধর নন্দদুলালের পূজারী—ম্যানেজার-সাহেবের কুঠির কাছে, রশি দুই দূরে, প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় চালা বেঁধে দেবতার সে সান্ধ্য আরতি করে। কথিত আছে, রায়-বংশের শেষ স্বাধীন জমিদার বিজয়-বর্ধন এই বটবেদীতলে বসে নির্জন উপাসনা করতেন এবং এই উপাসনারই এক ফাঁকে তাঁর মনে বিস্তীর্ণ দীঘি খনন করবার স্বপ্ন জেগে ওঠে। আর নন্দদুলালকে এই দীঘি খুঁড়তে গিয়েই গভীর মাটির স্তর থেকে উদ্ধার করা হয়। বারো ইঞ্চিটাক লম্বায় কালো কষ্টিপাথরের নিখুঁত, নিটোল একটি মূর্তি। বিজয়বর্ধন তাকে মহাসমারোহে ঘরে তুললেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জমিদারিটা তোলপাড় হয়ে উঠলো। কিন্তু আখেরে সুখ হলো না, বিজয়বর্ধনের বিরাট রাজপ্রাসাদের একটি-একটি করে বাতি নিবতে লাগলো। শেষ যখন বিজয়বর্ধনের কনিষ্ঠ ছেলেটি ফুসফুস পচে মারা যায়, কথিত আছে, বিজয়বর্ধন একদিন

ক্ষিপ্ত হয়ে নন্দদুলালকে জানলা দিয়ে বাইরে প্রান্তবর্তী সেই দীঘির মধ্যেই ফের ছুঁড়ে ফেলে দেন। বিজয়বর্ধন যত দিন বেঁচে ছিলেন, সেই দীঘিতে কেউ জাল ফেলা দূরের কথা, ডুব দিতে পর্যন্ত পারেনি।

তারপর মন্দিরের দেয়ালের একেকখানা করে খসে গেছে ইঁট, যেখানে ছিলো আলোকিত জনতার উৎসব, সেখানে আজ শ্মশানের স্তব্ধতা। কেটে গেছে কটা বংশক্রম তা কেবল ইতিহাসেই লেখা আছে। এমনি সময়, ইদানি, বছর কয়েক আগে, গঙ্গাধর কোথা থেকে এক মূর্তি পায় কুড়িয়ে। লোক থেকে লোকে পূর্বতন নন্দদুলালের যে-বর্ণনা ছিলো, এ-মূর্তির সঙ্গে নাকি তার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। গঙ্গাধর তাকে অবিশ্যি নন্দদুলাল বলেই চালিয়ে দিলে, যদিও জল থেকেই সে কুড়িয়ে পেয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। মূর্তির মুখটা বিনষ্ট, বিকৃত; গঙ্গাধর বলে বেড়ায়, বিজয়বর্ধনের সেই ছুঁড়ে ফেলার দরুনই এটা হয়ে থাকবে, তা ছাড়া অন্যান্য অবয়বের সৌষ্ঠবে এতোটুকু একটা আঁচড় পড়েনি। বিজয়বর্ধনের মৃতাবশিষ্ট ক্ষীণবল উত্তরাধিকারীরা একে বিসর্জিত নন্দদুলাল বলে স্বীকার করতে চাইলো না। তাতেও গঙ্গাধর দমেনি, উপরিতন মালিকের কাছ থেকে পুরোনো, প্রসিদ্ধ সেই বটের তলদেশটুকু নামমাত্র খাজনায় পত্তন নিয়ে ছোট একখানি চালা বেঁধে দেবতাকে সে প্রতিষ্ঠিত করলে। কিন্তু দেবতার দুর্ভাগ্য, তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারলেন না, মাঝের থেকে গঙ্গাধরকেই সবাই ফেরেববাজ বলে ধরে নিলে। কিন্তু গঙ্গাধরের ভক্তি অচল। মূর্তিকে মূর্তি ভাবলেই পুতুল, প্রতিমা ভাবলেই দেবতা। গঙ্গাধরের বিশ্বাস, যাই সে নিজে হোক না কেন, তার দিন একদিন ফিরবে।

গঙ্গাধর একেবারে নিশীথের শরণাপন্ন হলো। তার দায় যদি কেউ ঘাড় পেতে তুলে নেয়, তবে সে এক মাস্টার।

রাত তখন প্রায় দশটা, মিনতি পড়েছে ঘুমিয়ে, নিশীথ বারান্দায় বসে পড়ছিলো, গঙ্গাধর নিশীথের দরজায় এসে ঘা দিলো।

নিশীথ চলে এলো বাইরে, বললে, ‘এত রাতে, ব্যাপার কী?’

গঙ্গাধর ত্রস্ত, পাংশু গলায় বললে, ‘এ তো ভীষণ বিপদের কথা, মাস্টার।’

‘কেন?’

‘দেবতার মন্দিরে এ কী উৎপাত!’

‘অর্থ?’

‘হ্যাঁ, দেবতার আরতি যে বন্ধ হয়ে যায়।’

‘বন্ধ হয়ে যায়!’

‘হ্যাঁ, ঘণ্টা-কাঁসর আর বাজানো যাবে না।’

‘কার হুকুম?’

‘সর্বময়ী মেম-সাহেব।’

‘কারণ?’

‘তিনি গ্রামোফোন দিয়েছিলেন, বাইরের বাজনায় তাঁর গান-শোনায় ব্যাঘাত হচ্ছিলো।’

‘আর তাই তুমি মানলে?’

‘না মেনে উপায় কী বলো? যারা মেম-সাহেবের দুর্দান্ত সেই হুকুম নিয়ে এসেছিলো, তারা আমাকে দূরের কথা, দেবতাকে পর্যন্ত অক্ষত রাখতো না।’

‘বটে!’ নিশীথ অহেতুক রাগে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত হয়ে উঠলো : ‘দাঁড়াও, দেখি তোমার মেম-সাহেবের কত স্পর্ধা!’

দরজার গোড়ায় বিষণকে সে বসিয়ে রাখলো। বললে, ‘মা যদি উঠে আমাকে খোঁজ করে, বলিস, হঠাৎ এক বাবুর সাংঘাতিক অসুখ করেছে, আমি দেখতে গেছি।’

সে যেন এমনি একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো। সঙ্গে একটা লণ্ঠন নেবার জন্যেও দাঁড়ালো না। সোজা একেবারে সেই বটতলায়।

দূর থেকে গ্রামোফোনের তখনো ক্ষীণায়িত সুর শোনা যাচ্ছে। এটা

ডিনারের পর। সঙ্গে-সঙ্গে কতগুলি স্খলিত হাসির টুকরো।

নিশীথ কাঁসরে বাড়ি দিলো।

সেই ডাকে মানুষ ছার, দেবতাদেরও ঘুম ভেঙে জেগে ওঠবার কথা।

সেই শব্দের আঘাতে রাত্রির আকাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো।

ভক্তিতে নয়, রাগে যেন নিশীথ অন্ধ হয়ে গেছে।

চকিত কতগুলো আলোর টুকরো, দ্রুত কতগুলো পায়ের শব্দ নিমেষে উচ্চকিত হয়ে উঠলো। দেখা গেলো, স্বয়ং নির্মল তাদের দলপতি। নিশীথ একটা আরাম অনুভব করলে।

হাতের টর্চটা দোলাতে-দোলাতে নির্মল গঙ্গাধরকে জিগগেস করলে : 'হঠাৎ এত জোর য়্যালার্ম-বেল দিতে শুরু করেছ কেন? বাঘ পড়লো নাকি?'

গঙ্গাধরের আগে নিশীথ এলো এগিয়ে; বললে, 'সন্ধেবেলায় দেবতার আরতি সম্পূর্ণ হতে পারেনি, তাই।'

নিশীথের মুখের উপর টর্চটা ফ্ল্যাশ করে নির্মল চমকে উঠলো : 'এই সেই মাস্টারটা না?'

তীব্র আলোয় তার দৃষ্টি তখন ঝলসে গেছে, তাই নবনীতার মুখের দিকে সে তাকাতে পারলো না, শুধু তার মুখে অস্ফুট, ক্ষীণ একটা আওয়াজ শুনলো : 'দ্যাট্ ভারমিন!'

নির্মল রূঢ়, তীক্ষ্ম গলায় বললে, 'আরতি হতে পারেনি মানে?'

'আরতির বাজনায় আপনাদের সূক্ষ্মতরো গীতশ্রুতিতে ব্যাঘাত হচ্ছিলো বলে আপনারা আপত্তি তুলেছিলেন—'

'মিথ্যে কথা।' নির্মল গর্জন করে উঠলো : 'তোমাকে কে বললে?'

'গঙ্গাধর।'

নির্মল গঙ্গাধরকে তাড়া দিলো : 'বলেছ এ-কথা?'

গঙ্গাধর ভিজে চুপ্‌সে গেলো। কুঁজো হয়ে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, 'আজ্ঞে, ঠিক তেমন করে বলিনি। বলেছি, দেবতার জায়গা, তবু

কিনা সাহেব খাজনা চান। চাল আর চিনি নিয়ে কারবার করি, খাজনা কোথায় পাবো?'

'আর তুমি কিনা আমার নামে মিথ্যা রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছ, দেবতার আরতিতে আমি আপত্তি তুলেছি?' নির্মল হুঙ্কার দিলে।

নিশীথের তখন গঙ্গাধরের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই। সে আচ্ছন্নের মতো বললে, 'আপত্তি যদি না-ই থাকে, তবে কেন এ-ব্যাপারে আপনি নাক ঢোকাতে আসছেন?'

'কিন্তু জিগগেস করি, রাত এগারোটায় তোমার আরতির সময় নাকি?'

'দেবতার পূজায় সময়-অসময় নেই।'

ব্যঙ্গে ধারালো, অজস্র হাসিতে নবনীতা হঠাৎ উৎসারিত হয়ে পড়লো : 'কী আশ্চর্য দেবভক্তি!'

নিশীথের কথার পিঠে নির্মল বললে, 'তা না থাক, কিন্তু গুণ্ডামির নিশ্চয়ই একটা সময়-অসময় আছে। এটা কার জায়গা তা জানো?'

'দেবতার।'

'হোক দেবতার, কিন্তু রাজার আইনে এর জন্যে যে কর ধার্য আছে সে খবর রাখো?'

'দরকার বোধ করি না।'

নিশীথের এই প্রচণ্ড হঠকারিতায় নির্মল হতভম্ব হয়ে গেলো। নবনীতার দিকে তাকিয়ে বললে : 'এ-লোকটা গায়ে পড়ে এমন গুণ্ডামি করছে কেন বলতে পারো?'

'দেবতার ওপর যা ভক্তি—বাঁচলে হয়!' নবনীতা তেমনি তীক্ষ্ণ হাসলো।

'ঠিক বলেছ, বাঁচলে হয়!' নির্মল পুনর্বার নিশীথকে লক্ষ্য করলে : 'আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ তার পরিণামের কথা কিছু ভেবেছ?'

'নিজের পরিণামের কথা ভাবুন।'

'এ বড়ো বেশি দার্শনিক কথা কয়। ফিরে চলো।' নবনীতা স্বামীর বাহুতে ঈষৎ আশ্লিষ্ট হয়ে ধীরে আকর্ষণ করলে।

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' নির্মল বললে।

ফিরে যাচ্ছিলো, নবনীতারই আকর্ষণে তাকে আবার থামতে হলো। নবনীতা অন্ধকারে কী যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে।

নির্মলের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে দেবতার মূর্তির উপর সে আলো ফেললে, উল্লাসে উঠলো উচ্ছ্বসিত হয়ে : 'দ্যাখো, দ্যাখো, মূর্তিটা কিন্তু ভারি সুন্দর। এ ডেন্টি থিং ফর আওয়ার ড্রয়িংরুম। বুদ্ধ আর গণেশের মূর্তির পাশে চমৎকার মানাবে, নয়?'

কৌতূহলী হয়ে নবনীতা হয়তো আরো কয়েক পা এগিয়ে আসছিলো, নিশীথ প্রেতায়িত, বিবর্ণ গলায় বললে, 'কাছে এসে যদি দেবতাকে প্রণাম করতে চান তো দয়া করে পায়ের জুতো-জোড়া খুলে আসুন।'

নবনীতাকে কে যেন ধাক্কা মেরে মাটির উপর সবলে দাঁড় করিয়ে দিলে। মুখোমুখি তাকাতে গিয়েছিলো হয়তো, চোখ ফিরিয়ে নিলো। স্বামীকে সজোরে আকর্ষণ করে বললে, 'চলো, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।'

যাবার আগে নির্মল গঙ্গাধরকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখুনি আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে।'

গঙ্গাধর ভয়ে কাগজের মতো শুকিয়ে গেলো।

ভিড়টা সরে গেলো আস্তে-আস্তে। নিশীথ গঙ্গাধরের হাতটা নিদারুণ চেপে ধরে রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলে : 'আমার কাছে এত সব মিথ্যা কথা বলে এলে কেন?'

হাত ছাড়িয়ে নেবার বৃথা কয়েকটা চেষ্টা করে গঙ্গাধর থামলো। বললে, 'কই আর মিথ্যে বললুম। গোড়াতেই সব কথা খোলসা করে বলতে পারি না, আমার স্বভাব তো তুমি জানো।'

'দেবতার পুজোয় সাহেব আপত্তি করেছে, ঘটা করে মিথ্যে কথাটা আমাকে বলবার তোমার কী দরকার পড়েছিলো শুনি?'

'হরে-দরে সেই এক কথাই তো হলো। সব কথা আমাকে তুমি আগে থাকতে খুলে-মেলে বলতে দিলে কই? হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে একেবারে একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে।'

'কী কথা?' নিশীথ আরো জোরে চাপ দিলো।

'মেম-সাহেব আমাকে বললে, গঙ্গাধর, তোমার অনেক দিনের খাজনা বাকি, এবার দিয়ে দাও ঝট্‌পট্‌, আর না দাও তো তোমার দেবতা-টেবতা নিয়ে অন্যত্র পথ দেখ। তা, খাজনা আমি কোথা থেকে দিই বলো দিকি?'

'তবে এই বললে যে আরতি বন্ধ করে দিতে চায়?'

'ও তো সেই কথাই হলো। এত বিদ্বান তুমি, আর এ-কথাটা তোমার মাথায় ঢুকলো না, মাস্টার? দেবতা যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যান, তবে পুজো-আচ্চাটা কি করে আর এখানে হয় জিগগেস করি? তখন সেটা চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেলো না?'

'আর এই যে বলছিলে গ্রামোফোনের গান দেয়াতে কী আপত্তি—'

'তুমিই বলো,' গঙ্গাধর হাতের যন্ত্রণা ভুলে মুখে প্রসন্ন একটি বিজ্ঞতার ছবি ফোটালো : 'তুমি তো একটা মস্ত গুণী লোক, তুমিই বলো, দেবতার যখন আরতি হচ্ছে, তখন কাছাকাছি ও-সব বিলিতি নাচ-গান বরদাস্ত করা যায়? ওদের উচিত ছিলো না তখন সেটা চুপচাপ তুলে রাখা?'

নিশীথ নিমেষে হিম, স্তব্ধ হয়ে গেলো। রাত্রির অন্ধকারে সে যেন এখানে কোনো অপদেবতার নিষ্ঠুর উপহাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'মিথ্যাবাদী, নচ্ছার, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!'

গঙ্গাধরকে সবলে এক বিশাল ধাক্কা দিয়ে নিশীথ অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো।

আর গঙ্গাধর হাড়ের মধ্যে কাঁপতে-কাঁপতে কাঁদো-কাঁদো মুখে চলে এলো নির্মলের কুঠিতে।

নবনীতা আর নির্মল তাদের ড্রয়িং-রুমে কোণের দুখানা বিচ্ছিন্ন চেয়ারে বসে। রাগের জ্বালাটা এসেছে পড়ে, আবার তাদের মধ্যে রাত্রি অস্ফুটস্বরে কথা কইতে শুরু করেছে। বারান্দার কাছাকাছি গঙ্গাধরকে দেখতে পেয়ে নির্মল চিড়বিড় করে উঠলো। নবনীতা উঠলো লাফিয়ে : 'আমার মাথায় একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট আইডিয়া এসেছে। সত্যি।'

'কি?' নির্মল সানন্দ ঔৎসুক্যে জিগগেস করলে।

'এখন বলবো না, কিন্তু ভয় নেই, এখুনি তুমি জানতে পারবে। গঙ্গাধরকে কেন ডেকেছ বলো তো?'

নির্মল সহাস্য মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

'বিশেষ কোনো কারণ নেই, অত্যন্ত রাগ হয়েছিলো তাই আসতে বলেছিলে, তাই নয় কি?'

'হবে। মনে পড়ে না।'

'হ্যাঁ, তাই। কেননা, তুমি জানো, খাজনা ও দিতে পারবে না, আর এমন কিছুও ওর নেই যে খাজনার ওজুহাতে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি।'

'জানি না।'

'তবে বেশ, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমিই ওকে ম্যানেজ করবো। তুমি কিছু বলতে পাবে না।'

'তথাস্তু।' নির্মল পাশের স্ট্যাণ্ড থেকে কি-একটা বই টেনে নিলো।

নবনীতা খুশিতে হালকা হয়ে গেলো। ডাকলো : 'গঙ্গাধর!'

গঙ্গাধর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝের উপর, উত্তাল শোকাকুলতায়। নবনীতা আস্তে গম্ভীর গলায় বললে, 'চুপ করো। এখানে আর তোমাকে এখন চেঁচামেচি করতে হবে না।'

গঙ্গাধর থেমে গেলো, দাঁড়িয়ে রইলো শরীরে একটা ভাঙা ভঙ্গি

করে, মাঝে-মাঝে অবরুদ্ধ শোকের উচ্ছ্বাসে তার মুখটা সরু-মোটা রেখায় অসম্ভব বেঁকে-চুরে যাচ্ছে।

'তোমাকে মাপ করতে পারি, যদি তুমি এক কাজ করো,' নবনীতা শান্ত, একটু প্রচ্ছন্ন গলায় বললে, 'বলো, করবে?'

হাত কচলাতে-কচলাতে গঙ্গাধর বললে, 'এমন কী কাজ নেই যা আপনাদের জন্যে করতে না পারি?'

নির্মল তার বইয়ের মধ্যে মুখ ঢেকে এ-দৃশ্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেললে।

'বেশ, তোমার আর খাজনা লাগবে না,' নবনীতা তীক্ষ্ন চোখে গঙ্গাধরকে পর্যবেক্ষণ করলে : 'যদি ও-মূর্তিটা আমাকে দিয়ে দাও।'

গঙ্গাধর এক পা যেন পিছনে সরে গেলো, পরে নিজেকে সংগ্রহ করে কাতর মুখে বললে, 'ওটাকেই যদি দিয়ে দিতে হয়, তবে খাজনাই বা আর কার জন্যে লাগবে?'

'বেশ,' নবনীতা গলাটা পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে বললে, 'একশোটা টাকা না-হয় তোমাকে দিচ্ছি।'

আরেক ধাক্কায় গঙ্গাধর এবার সামনের দিকে ছিটকে এলো। ব্যাপারটা যেন সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলো না, প্রস্তাবটা এমন আকস্মিক অভিনব। ক্ষীণ আপত্তির সুরে সে বললে, 'কিন্তু দেবতার মূর্তি—'

'বেশ, তোমাকে দু'শো টাকা দেবো, গঙ্গাধর। আস্ত দু'শো টাকা। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।'

ও-পাশে নির্মলের হাতের থেকে বইটা হাঁটুর উপর খসে পড়েছে। বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত ভঙ্গি।

নবনীতা হাত তুলে নির্মলকে নিরস্ত করলে : 'তুমি এর মধ্যে কিছু বলতে এসো না।' পরে গঙ্গাধরকে লক্ষ্য করে : 'যে-মূর্তিটা তুমি একদিন জঙ্গলে বা পথের ধুলোয় কুড়িয়ে পেয়েছিলে, তার জন্যে নগদ দু'শো টাকা তুমি পাচ্ছ, একেবারে আকাশ-ফুটো। তোমার কিছু ভয়

নেই গঙ্গাধর, আমার এখানে এসে তোমার দেবতার কোনো অসম্মান হবে না, আমি তাকে পুজো করবো রীতিমতো, ভোগ দেবো, আরতি করবো, যা-যা তুমি করতে। তোমার ঐ নোংরা বিশ্রী বটতলা থেকে দেবতা এখানে অনেক আরামে থাকবেন।'

গঙ্গাধর গলা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, 'কিন্তু আড়াই শো টাকা না হলে—'

গঙ্গাধর নিতান্ত বোকা, নিতান্ত আনাড়ি, দেয়ালে তার মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হলো—নবনীতা যখন তাইতেই রাজী হয়ে গেলো এক কথায়।

'বেশ, তাই পাবে।'

গঙ্গাধর ভীত, বিবর্ণ মুখে বললে, 'কিন্তু আমার কী হবে?'

'কী আবার হবে! এত দিন দেবতার সেবা করলে, তাই তিনি তোমাকে অযাচিত পুরস্কৃত করলেন।'

'কিন্তু এখানে মুখ দেখাবো কি করে?'

'প্রতিদিনই দেবতার পুজো হাত বদলাচ্ছে। কাল তুমি পুজারী, আজ আমি। এতে লজ্জা কিসের? তুমি যদি মরে যাও, তা হলে কি দেবতাও মরে যাবেন?' নবনীতা সমবেদনার সুরে বললে, 'আর লোকের কথাকে যদি ভয় করো, কোথাও চলে যাও না সটান, কে তোমাকে ধরে রাখছে? শেষ রাত্রেই তো ট্রেন। অন্য কোথাও গিয়ে আবার নতুন করে ব্যবসা ফাঁদো।'

অন্ধকারে গঙ্গাধর যেন আলো দেখতে পেলো।

'এটা তুমি কী করলে?' গঙ্গাধর চলে গেলে নির্মল ফেটে পড়লো : 'সামান্য একটা মূর্তির জন্যে আড়াই শো টাকা?'

'হ্যাঁ, জীবনে অনেক জিতেছি, একবার না-হয় ঠকলাম।' নবনীতা স্বামীর দিকে নির্লিপ্ত, শান্ত মুখে তাকালো : 'কিন্তু তুমিই বলো, মূর্তিটা খুব সুন্দর নয়?'

'কিন্তু এত দাম—অসম্ভব!'

'মাহাত্ম্যটা দামে নয়, জিনিসটা যে একান্ত করে আমার হলো, তাতে। দাম তোমার থাকবে না, কিন্তু জিনিসটাই থাকবে দামী হয়ে! নইলে ধরো, সামান্য একটা ছাপ-মারা ডাক-টিকিট বা রঙ-চটা একটা ছবির কী বিজাতীয় একেকটা দাম হয়! নিজে মূল্য দিলেই মূল্য—ও একটা নিছক কল্পনার জিনিস, ওর কোনো স্থূল অস্তিত্ব নেই!'

'কিন্তু আমি বলছি কি, চেষ্টা করলে আরো সস্তায় তুমি পেতে পারতে।'

'হয়তো পেতাম, কিন্তু দরাদরি করতে যেটুকু দেরি হয়, অকারণ স্নায়ুর উত্তেজনা—এতটুকু দেরি পর্যন্ত আমার সইছিলো না।' জয়ের আনন্দে নবনীতা জ্বলে উঠলো : 'ভয় হচ্ছিলো মনের সূক্ষ্ম ওঠা-পড়ার কোনো ফাঁকে দাঁওটা ফসকে যায় একেবারে! ওটা আমার চাই, তাই যে করে হোক ওটা আমাকে পেতে হবে। ছল করে পাওয়া, জোর করে কাড়া, বা দাম দিয়ে কেনা—আমার কাছে সব সমান!'

তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে নির্মল জিগগেস করলে : 'ওটাকে তা হলে তুমি পুজো করবে নাকি?'

'আপাতত আমার ড্রয়িং-রুমটা তো সাজাই।' নবনীতা তার ভঙ্গিতে খুশির একটা চাপল্য আনলে, নির্মলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে বললে, 'আর, কাল ভোরে তোমার মাস্টারকে তো একবার ডেকে আনো!'

[চোদ্দ]

সমস্ত ব্যাপার শুনে মিনতি ম্লান হয়ে গিয়েছিলো, তাই সকালবেলা ম্যানেজার-সাহেব যখন নিশীথকে ফের তলব করে পাঠালেন, তখন সে এতটুকুও আশ্চর্য হলো না। বললে, একটু-বা ঠেস দিয়ে সে বললে,

'আপত্তি করবার কারণ নেই, এ তোমার দস্তুরমতো কেতাদুরস্ত চিঠি।'

ঘটনাটা ঘটে যাবার পর নিশীথ নিজেকে কেমন অপরাধী বোধ করছিলো মিনতির কাছে। এতটা বাড়াবাড়ি করবার কোনোই যে তার কারণ ছিলো না—তার অন্যায় ও অতিরিক্ত উৎসাহের পরিশেষে সেই প্রচণ্ড নিষ্ফলতা তাকে নিরন্তর অস্থির করে তুলছিলো। তার বিদ্রোহের ধ্বজাটা যে এমন করে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হবে, তার পরাজয়ে যে কোনোই মহিমা থাকবে না, বরং হয়ে দাঁড়াবে যে এমন একটা নির্জলা উপহাসের জিনিস, এমন কি মিনতির কাছে পর্যন্ত, এ তার কল্পিততম পরম দুর্ভাগ্যের দিনেও সে ভাবতে পারতো না।

কে কোথাকার গঙ্গাধর, গারো-পাহাড় থেকে বিষাক্ত একটা কেউটে নেমে এসেছে, তারি জন্যে সে কিনা দিতে গিয়েছিলো তার বুকের রক্ত!

এর পর তার চাকরিটা যাওয়াই যেন পরম স্বস্তি, আর কোথাও না-হোক তার নিজের কাছে। তা হলেই যেন সে নিজের কাছে ভাগ্যের ব্যবহারের নিশ্চিন্ত একটা সমর্থন খুঁজে পায়।

তাই নিশীথ মৃদু হেসে বললে, 'সোজা তো চিঠিতেই চাকরি-নাকচের খবরটা দিতে পারতো, মিছিমিছি আবার ডেকে পাঠানো কেন?'

মিনতি বললে, 'ঠিক মরেছে কিনা দেখবার জন্যে হয়তো মৃতদেহের উপর অস্ত্রাঘাত করতে চায়।'

'হয়তো তাই,' নিশীথ চাপা গলায় বললে : 'কিন্তু যদি না যাই?'

'তা যাবে কেন? সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আর তোমার সাহস আছে?'

'আছে।' নিশীথ উঠে দাঁড়ালো : 'যে একদিন নিশ্চিন্ত উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াবে, তার সাহসের অন্ত নেই, মিনতি।' ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবিটা সে তুলে নিলো : 'চললুম, তল্পি-তল্পা বাঁধতে শুরু করে দাও গে।'

'খোলা আকাশের নিচে এসে যে দাঁড়াবে তার আবার তুচ্ছ জিনিসের উপর লোভ কেন?'

নিশীথ কুণ্ঠিত পায়ে মিনতির সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'জানি তুমি আমার ওপর ভয়ানক চটেছ—কী বলে, আমার সেই অকারণ, নিরর্থক নির্বুদ্ধিতার জন্যে। কিন্তু, নিজে ইচ্ছে করে চাকরিটা খোয়ালাম বা অন্যে জোর করে চাকরিটা কেড়ে নিলো—এর মধ্যে কোনোই তফাত নেই, যখন সত্যি-সত্যি চাকরিটা তোমার যায়। যায়, যাবে,' নিশীথ তার হাতের মুঠির মধ্যে মিনতির শিথিল একখানি মণিবন্ধ টেনে নিলো: 'একবার শুধু আমাকে সত্যি-সত্যি সাহসী হতে দাও, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।'

'তার মানে?' মিনতি কী বুঝে যেন চমকে উঠলো।

'একেবারে এখনো মরিনি, মিনতি, তাই অস্ত্রাঘাতকে প্রসন্ন মনেই নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছি।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, সমুদ্রে যে শোবে, শিশিরকে তার ভয় করলে চলবে না।' মিনতির চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে নিশীথ বললে, 'আমি তো গেছি, কিন্তু তাদেরও এমনি পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকতে দেবো না।'

মিনতি হেসে ফেললো: 'পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে তুমি ঢিল ছুঁড়বে? সে-ঢিল তাদের স্পর্শও করবে না, ফিরে আসবে নিচে, আরো নিচে, যেখানে তুমি গেছ চলে, আর তোমারই ঠিক মাথার ওপর।'

'দেখা যাক,' নিশীথ রূঢ় একটা ভঙ্গি করে ঘুরে দাঁড়ালো।

'শোনো।' মিনতি তাকে বাধা দিলো: 'পরের সুখ সহ্য না হবার যে-দুঃখ, সে-দুঃখের মতো লজ্জা আর অপমান কিছু হতে পারে না। অন্যে সুখী হোক, আমরাও সুখী হবো।' মিনতি স্বামীর বাহুর কাছে হেলে দাঁড়ালো: 'আমাদেরও নিচে তো আরো কত লোক আছে।'

নিশীথ ম্লান হাসলো। বললে, 'আমাদেরও নিচে আরো লোক আছে

এই ভেবে যদি সান্ত্বনা পেতে হয়, সেই ধার-করা সান্ত্বনায় আমার কাজ নেই।'

'তবে, ভাবো, কেউ কোথাও লোক নেই, আমাদের সামনে আর পিছে,' মিনতি এক হাতে নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরলো : 'পৃথিবীতে আমি আর তুমি যে আছি এই তো আমাদের যথেষ্ট। সেইখানেই আমাদের সমস্ত শক্তি আর আশা।' পরে অশ্রু-ভরো-ভরো মিনতিময় চোখ তুলে : 'যাও, কিন্তু অনর্থক আর কোনো হাঙ্গামা বাধিয়ো না। দুঃখ যা আসে তা যেন শান্ত, সহজ হয়েই দেখা দেয়।'

নিশীথকে আজকে আর কাগজের শিলপে নাম পর্যন্ত লিখে দিতে হলো না। সমস্ত দৃশ্যটি তার জন্যে যেন নিখুঁত তৈরি হয়ে আছে।

ম্যানেজার-সাহেব আজ তার আপিস-ঘরে বসে নেই। নিয়মের ব্যতিক্রম করে তার ড্রয়িং-রুমে এসে বসেছে।

বেয়ারা তাকে সরাসরি ভিতরে নিয়ে এলো।

নির্মল একটা চেয়ারে বসে বিস্তারিত খবরের কাগজ পড়ছে, আরেকটা কৌচে দূরে বসে নবনীতা নিচু চোখে উল বুনছে।

পাষাণকায় নিস্তব্ধতা।

নিশীথ নিজেকে ভারি নিরাবলম্ব, অসহায় মনে করতে লাগলো। সে-ও নড়লো না।

কে এসেছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও নির্মল কাগজের থেকে মুখ না তুলে জিজ্ঞাসা করলে : 'কে?'

নবনীতাও তার উল থেকে চোখ তুললো না, বললে, 'সেই মাস্টার।'

কাঁধ দুটো সঙ্কুচিত করে নির্মল হাসলো। নবনীতাও নিঃশব্দে তাকে অনুকরণ করলে।

কাগজটা হাঁটুর উপর মুচড়ে রেখে কাঁধ দুটো একটু নেড়ে-চেড়ে নির্মল খাড়া হয়ে উঠে বসলো। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'তা হলে তুমি কি বলো, নীতা?'

'সে তো ঠিক হয়েই গেছে অনেকক্ষণ।' নবনীতা উদাসীন মুখে বললে।

'তবে তাই—তোমার যা ইচ্ছে।' নির্মল খবরের কাগজটা ফের মেলে ধরলো।

'হ্যাঁ, একটা পুঁচকে ইস্কুল-মাস্টারের পচা চাকরি খুইয়ে আমাদের লাভ কী?' নবনীতা কুটিল, কুঞ্চিত মুখে বললে, 'ও-জায়গায় আবার তো সেই একটা ইস্কুল-মাস্টারই রাখতে হবে।'

'যা বলেছ, কী ট্র্যাজেডি, ও-জায়গায় কিছুতেই একটা বনমানুষ বসানো যাবে না।' নির্মল কাগজ ফেলে দিয়ে প্রসন্ন, তরল কণ্ঠে অনর্গল হেসে উঠলো।

নিশীথ কালো হয়ে গেলো সর্বাঙ্গে। হাসিটা স্তব্ধতায় নেমে আসতেই সে বললে, একটু-বা বেপরোয়া, কঠিন ভঙ্গিতে : 'আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন জানতে পাই?'

'লর্ড, এতক্ষণেও জানতে পারোনি?' নির্মল কি ভেবে আবার উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলো।

'না।' নিশীথ বললে।

'স্কুলের মাস্টার—কথাটা খোলসা না করে' দিলে চট্ করে বুঝবে কেন?' নবনীতা ফোড়ন দিলো।

'হ্যাঁ, কাল যা ব্যবহার করেছ, তা-ও তোমার কারিকিউলাম-এ পড়ে না, মাস্টার,' নির্মল মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া ফেললো : 'ওর জন্যেই, ঐ তোমার দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্যেই, তোমার চাকরিটা স্বচ্ছন্দে খেয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু—'

নিশীথ স্তব্ধ হয়ে রইলো।

'কিন্তু আমার স্ত্রী দয়া করতে বললেন, তাই, তাই এ-যাত্রা ছাড়া পেয়ে গেলে।'

'দ্বিতীয় বার।' কানে-কানে বলার মতো করে নবনীতা যেন

নিশীথকেই চুপি-চুপি বললে। নিশীথ মুখ তুলে তাকালো না নবনীতার দিকে। কিন্তু বাতাসে অসহ্য একটা জ্বালার মতো তার উপস্থিতির তাপ সে অনুভব করলে। তার শরীরের বিলসিত বিহ্বলতা, তার পোশাকে আধুনিকতার ঔদ্ধত্য, তার বসবার ভঙ্গিতে এই বিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত।

'এইবার থেকে ভদ্রলোকের মতো চলা-ফেরা কোরো,' নির্মল যেন তাকে সস্নেহ শাসনের সুরে বললে, 'নইলে কে জানে কোথায় কোনো সাপ-খোপ হয়তো মাড়িয়ে দেবে অন্ধকারে।'

ইঙ্গিতটা ছুরির ডগার মতো ধারালো।

নিশীথ বললে, ঠোঁটে একটু বা ব্যঙ্গের ভঙ্গি করে, 'ঐ চাকরিটার জন্যে আমি বিশেষ লালায়িত নই। ওর জন্যে কষ্ট করে কাউকে ক্ষমা করতে হবে না।'

নির্মলকে যেন কে একটা ধাক্কা দিলে। বলে কি লোকটা?

নবনীতা একটুও চমকালো না, অন্তত তার মুখে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। কাঁটার উপর দিয়ে উলটা পেঁচিয়ে নিতে-নিতে সে বললে, 'তা আমরা ভেবে দেখেছি। কিন্তু শুধু আপনার কথা ভেবেই ক্ষমা করা হয়নি, সেটা মনে রাখবেন। হয়তো আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, কি বলো, (স্বামীর দিকে সে লক্ষ্য করলো) হয়তো বা আরো কোনো প্রার্থী পরিজন আছে, যাদের ভাগ্য আপনার সঙ্গে জড়িত, তাদের কথা মনে করেই আপনাকে আর মারলুম না।' নবনীতাই যেন সমস্ত অভিনয়টার প্রযোজক এমনি নিরুদ্বেগ স্বাধীন ভাবে বললে, 'আপনি না-হয় উচ্ছৃঙ্খল, ভবিষ্যৎ ভেবে দেখেন না, কিন্তু যারা আপনাব উপর নির্ভর করে আছে, তাদের দিকেও একবার দৃকপাত করতে হয়, ভাবতে হয় তাদেরও সুখ-দুঃখ বলে দুটো জিনিস আছে।'

'অনেকের কাছে সেই দুটো জিনিস আবার এক।' নিশীথ স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে উঠলো। এতক্ষণ এতগুলি কথা-বলার মধ্যে

নবনীতা একবারও চোখ তোলেনি, বুননের ফাঁকে-ফাঁকে ঠিক ঘর গুনে-গুনে কাঁটা চালিয়ে গেছে, আর নির্মলও স্ত্রীর হাতে অভিনয়ের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নেপথ্যে বসে মুখ ঢেকেছে খবরের কাগজে—বরং বাইরের একজনের সামনে তার স্ত্রী যে তার ক্ষমতার বহুবিচিত্র পেখম বিস্তার করতে পারছে তারই শোভায় সে মুগ্ধ এমনি একখানা ভাবে বিভোর হয়ে আছে যেন তার সমস্ত ভঙ্গি। নিশীথও নবনীতাকে দেখবার চেষ্টা করলো না, শুধু নিজেকে শুনিয়ে-শুনিয়েই যেন বললে, 'আমার স্ত্রী বা অন্য-কেউ পরিজন, যারা আমার ওপর নির্ভর করে আছে, তারা আমার সঙ্গে দুঃখ ডেকে নিতে ভয় পায় না। তারা আমার সঙ্গে পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।'

'সে-সব দিন গেছে, দুর্বল কল্পনা করবার দিন,' নবনীতা ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম রেখায় একটু হাসলো কিনা বোঝা গেলো না; বললে, 'ও সব দুজনে আমরা অনেক ভেবে দেখেছি। চাকরিটা নিলুম না তো নিলুম না, তার মাঝে অত জবাবদিহি কিসের?'

'হ্যাঁ, কোনো কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই,' নির্মল নিশীথকে যেন বিদ্ধ করলো : 'বাড়ি যাও, সাবধান করে দিচ্ছি, এবার থেকে ভালো করে কাজ কোরো, কোনোরকম আন্দোলন করা ইস্কুল-মাস্টারের কাজ নয়।'

'তা জানি। কিন্তু এরি জন্যে বাড়ি বয়ে ডেকে আনবার কী দরকার ছিলো?'

নবনীতা তার স্বামীর দিকে চোখ তুলে নিঃশব্দে যেন কী বললে।

'কী দরকার ছিলো!' নির্মল আবার হেসে উঠলো অনর্গল।

নবনীতা যেন তা উপেক্ষা করলো। তার পুরোনো ঔদাসীন্যে ফিরে এসে তেমনি স্বগতোক্তির মতো বললে, 'আপনারা তো শুধু আমাদের অত্যাচারই দেখেন, চোখ চেয়ে একবার ক্ষমা দেখুন।'

'দেখবার চোখ কোথায়?' নির্মল আরো উচ্চ হাসিতে ছড়িয়ে পড়লো।

বন্য, যেন হিংস্র একটা পশু হঠাৎ মানুষের গলায় হেসে উঠেছে।

নিশীথ একটা মূর্চ্ছার মধ্যে থেকে আমূল চমকে উঠলো। চেয়ে দেখলো, স্পষ্ট চোখে পড়লো এবার তার, তারই চোখের সামনে কোণে ছোট একটা টিপাইয়ের উপর নন্দদুলাল দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চল, নিরুদ্বেগ। আশ্চর্য, সেই নির্ভীক প্রশান্তি, সেই সতেজ বঙ্কিমা।

নিশীথের সেই মূঢ়, আচ্ছন্ন দৃষ্টির কাতরতা নবনীতা এতক্ষণে ঠিক ধরতে পেরেছে।

তাড়াতাড়ি সে মূর্তির কাছে উঠে গেলো। স্বামীকে ঢলে-পড়া গলায় সম্বোধন করে বললে, 'যাই বলো, ভারি সুন্দর দেখতে কিন্তু। দাম বেশি হয়নি, আমার সোনার আঙটিটা ঘষে দেখেছি, নিখুঁত কষ্টি-পাথর।'

কী অসম্ভব মজা পেয়ে নির্মল হাসতে লাগলো লুটিয়ে-লুটিয়ে : 'না, বেশি হয়নি। আমি এখন স্বীকার করবো, নীতা, আড়াই-শো টাকার ঢের বেশি টিকিট কেটে এ-দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু গঙ্গাধর— গঙ্গাধরের খবর জানো?' নির্মল যেন টুকরো-টুকরো হয়ে যেতে লাগলো।

'জানি, শেষ রাত্রের ট্রেনেই সে পালিয়েছে।'

'একেবারে দেশ ছেড়ে। পোঁটলা গুটিয়ে। আবার কোথায় গিয়ে নতুন কী ব্যবসা ফাঁদে কে জানে।'

নিশীথ এবার সম্পূর্ণ করে নবনীতাকে দেখলো। তার মনে হলো, শীতে ঝরে যাচ্ছে যে-গাছ, ও যেন তার শেষ সবুজ পাতা।

নিশীথ আস্তে-আস্তে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু পিছনে থেকে নবনীতা হেসে উঠলো : 'কী, সামনে এসে প্রণাম করে গেলেন না জুতো ছেড়ে?'

নিশীথ মুহূর্তমাত্র থামলো এসে দোর-গোড়ায়। ফিরে তাকালো সেই মূর্তির দিকে।

হায়, দেবতার মুখই শুধু আর নেই।

[পনেরো]

নিশীথ চলে গেছে স্কুলে, দুপুরবেলা, আর মিনতি চারদিক থেকে মশারিটা ফেলে দিয়ে এখানে-সেখানে ছোট-ছোট তালি দিচ্ছে।

প্রচণ্ড রৌদ্রে সবুজ ধানখেতগুলি কেমন হলদে দেখাচ্ছে, ট্রেনের লাইনটা কেমন পরিত্যক্ত, দূরের স্টেশনটা কেমন অবাস্তব, জনহীন।

এমন সময় উঠোনে কার জুতোর শব্দ হলো।

সাবরেজিস্টার বাবুর বড়ো ছেলে এ-বছর বি-এ পাশ করেছে, তাঁর স্ত্রীকে ঠিক বি-এ পাশ-করা ছেলের মা'র মতো দেখায় কিনা দেখাবার জন্যে সম্প্রতি তিনি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছেলে বি-এ পাশ করেছে বলে তিনি এক-জোড়া স্যাণ্ডেল কিনে নিয়েছেন, তাতে হয়তো পুরুষালি ভাবটাই বেশি, কিন্তু তাতে দোষ নেই, পায়ে যে জুতো শোভা পেয়েছে এতেই তাঁর মাতৃত্বের মর্যাদা। মিনতি ভাবলে সাবরেজিস্টার-দিদিই হয়তো দুপুরবেলায় টহলে বেরিয়েছেন।

কিন্তু, দেবতারাও জানেন না, মিনতির ঘরের মধ্যে আর কেউ নয়, স্বয়ং ম্যানেজার সাহেবের বউ।

মিনতি দুই চোখে অকূল অন্ধকার দেখলো। কী জানি সে তার লুট করে কেড়ে নিতে এসেছে। কোথায় তার কী আছে, টুকরো-টাকরা সোনা-দানা, শাড়ি-সেমিজ, দামী বলতে কীই বা তার আছে, ভেবে এক নিমেষে কিছুই সে কুলিয়ে উঠতে পারলো না। ধারে-পারে একটাও কোথাও লোক নেই যাকে ডাকা যায়, পাড়াটা এমন নির্জন, বাড়িতেও মানুষ বলতে সে নিজে, চাকরটা ঘুমিয়ে আছে রান্নাঘরের বারান্দায়, আর তা ছাড়া, কাউকে ডাকতে গেলেও গলায় তার স্বর ফুটবে কিনা সন্দেহ। মিনতি কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে ত্রস্ত হাতে মশারিটাই বুকের কাছে গুটোতে লাগলো।

'কি, আমাকে চিনতে পারেন?' নবনীতা স্মিত, স্নিগ্ধ মুখে জিগগেস

করলে। মিনতি তার মুখের দিকে বিমূঢ়ের মতো অনড় চোখে চেয়ে রইলো।

নবনীতা বললে, 'দিনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি মশারি ফেলে?'

মিনতির মুখে তবু কথা নেই।

'বসে রইলেন কি, মশারিটা তুলুন, একটু বসি।'

এতক্ষণে যেন মিনতির হুঁস হলো। মশারিটা সে তুলে ফেললো ক্ষিপ্র হাতে। তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলো।

'কেন, এই তক্তপোশেই না-হয় বসলুম, পাটির উপর।' নবনীতা বসলো।

মিনতি খানিকটা ভয় ও খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। বিস্ময়, এতটা সহজ ও অনুচ্চারিত তাকে কোনোদিন দেখায়নি; ভয়, হয়তো বা এটা কোনো নিপুণ ছদ্মবেশ, আর যাই হোক, এটা যে তার প্রকৃতিস্থতার চেহারা নয় তাতে সন্দেহ কি। পরনের শাড়িটা শান্তিতে শাদা, লালসায় উগ্র নয়। কোথাও যেন চাকচিক্যের রূঢ়তা নেই, আত্মঘোষণার নির্লজ্জতা, প্রখর রৌদ্রের দেশে হঠাৎ যেন সে মেঘের ম্লানিমা নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য, পরিপার্শ্বের আবহাওয়ার সঙ্গে কোথাও তাকে কিন্তু একটুও বেমানান লাগছে না।

সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে মিনতি জিগগেস করলে, ভীত, বিনীত গলায় : 'আপনি এখানে কেন এসেছেন জানতে পাই?'

'কেন এসেছি? কেন, এমনি কি পারি না আসতে?'

'পারেন বই কি। কে আপনাকে ঠেকাবে! কিন্তু গরিবের ঘরে রাজ-রাজেশ্বরীর পায়ের ধুলো পড়বে, এ কি কখনো ভাবা যায়?'

'কেন, আপনি জানেন না যে আমি গরিবের ঘরেই বেশি যাওয়া-আসা করি?' নবনীতা হাসলো।

'কিন্তু আমরা তাদেরও চেয়ে অনেক গরিব।' ভয়ে মিনতির বুকের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে গেলো।

'আপনার কিছু ভয় নেই, আমি এমনি এসেছি!' নবনীতা বললে, 'কতদিন থেকেই আসবো ভাবছিলুম। আপনাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করতো মাঝে-মাঝে।'

'গোড়াতেই তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, মনে নেই?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। আজ, এত দিনে পেরেছি মনে হচ্ছে।'

'আমাকে চেনবার কীই বা আছে বলুন।' মিনতি এক পাশে বসে পড়ে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত জড়াতে লাগলো।

'মানুষে মানুষকে আর কী বলে চেনে? পরস্পরের নাম দিয়ে তো?'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'দরকার নেই। আমাদের দেশে মেয়েদের তো স্বামীর নামে পরিচয়—আপনার স্বামীকে যে আমি চিনি।' নবনীতা পরিষ্কার বললে।

'আপনাদের সঙ্গে গিয়ে খুব একচোট ঝগড়া করেছিলেন বুঝি?' মিনতির চোখে একটি ভয় কাঁপছে।

'করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দিইনি। দিলেই তো বিপদ।'

'বিপদ, কিসের বিপদ?' মিনতি ভুরু কুঁচকোলো।

'যে মনিব, তার মন জুগিয়ে না চলে পদে-পদে তারই সঙ্গে ঝগড়া করলে কি চলে? মাঝখান থেকে চাকরিটিই হারিয়ে ফেলতে হয়। যা দিন-কাল—'

'চাকরির দিন-কাল না-হয় খারাপ, কিন্তু মনুষ্যত্বের বাজার-দরের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।' মিনতি চোখ নামিয়ে বললে।

'তা হলে আপনি আপনার স্বামীকে ঝগড়া করতে বলেন নাকি?'

'আমি বলতে যাবো কেন? তবে যদি তিনি কখনো বোঝেন যে তাঁর সম্মানের হানি হচ্ছে, বা এমন কোনো অন্যায় হচ্ছে যা মানুষের পক্ষে সহনাতীত, তবে তিনি যে তুচ্ছ চাকরির কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকবেন এ আমার মনে হয় না।'

'আচ্ছা, এ-ও আপনার কখনো মনে হয় না এই সম্মানবোধটাই আগাগোড়া একটা কুসংস্কার?' নবনীতার কথায় একটুও ঝাঁজ বা উত্তেজনা নেই : 'ওটা কি একটা আপেক্ষিক সংজ্ঞা নয়? নইলে ধরুন, গোড়াতেই তো মানুষ ভাবতে পারে যে চাকরি করতে যাওয়াটাই একটা প্রকাণ্ড অসম্মান!'

'ভাবতে পারেই তো।'

'তবু তো অনেকেই চাকরি করে, আর চাকরি শুধু করে না, চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করে।'

'তারা ভাবে না। তাই বলে জীবিকার্জনের জন্যে যারা চাকরিতে এসে ঢুকলো, তারা তাদের সম্মানবোধটা চৌকাঠের বাইরে রেখে এলো, এমন কথা আপনি ভাবতে পারেন না।'

'আমার তো মনে হয় ও-বোঝাটা দরজার বাইরেতেই নামিয়ে রাখা উচিত। নইলে ওটা সঙ্গে নিয়ে চাকরিতে ঢুকলে শেষ পর্যন্ত চাকরিও থাকে না, সম্মানও থাকে না।'

'তবে আপনি বলতে চান চাকরিতে যারা ঢুকবে তারা মনুষ্যত্বের পোশাকটাকে সম্পূর্ণ খসিয়ে দেবে?' মিনতির গলায় সামান্য ব্যঙ্গ যেন ঝিলিক দিলো।

'দেয়াই তো উচিত। চাকরির বাজারে ওটা বড় দামী পোশাক, যা মাইনে তা দিয়ে সেটা পোষা যায় না—যতো মাইনে, ততোই দেখবেন তার ফুটো।' নবনীতা যেন অতি কষ্টে একটু হাসলো : 'আমি তো মনে করি, যতক্ষণ চাকরিতে, ততক্ষণ নিজেকে জীবিকার শুকনো একটা যন্ত্র বলে ভাবা উচিত—ঘুমের মধ্যে শরীর যেমন কাজ করে, তেমনি মনোহীন অভ্যস্ত শরীর।'

'কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝে-মাঝে জেগে উঠতে হয় যে ঘুমের থেকে।' হাসিতে মিনতি ইশারাটা স্পষ্ট করে দিলো।

'জেগেই যদি সত্যি ওঠা যায়, তবে সামান্য একটা স্বপ্ন নিয়ে সুস্থ

লোক কেউ মাথা ঘামায় না। নইলে মনুষ্যত্ব যাকে বলছেন, তাকে একটা কাল্পনিক দাম দিতে যাওয়াও অমানুষিকতা। পান থেকে চুন খসলেই যদি সম্মানহানি হলো বলে কল্পনা করা যায়, তবে চাকুরের পক্ষে সেটা শেষ পর্যন্ত বিশেষ সম্মানজনক হয়ে ওঠে না।'

'দেখুন, কী করা যাবে।' মিনতি নিস্পৃহ মুখে বললে, 'সম্মান জিনিসটাই অশরীরী। কেউ হয়তো লাথি খেলেও অপমানিত হন না, আবার কেউ হয়তো সামান্য একটা ভ্রূকুটিতে সম্মান হারান। কী করা যাবে, সব মানুষ তো আর সমান মাপে গড়ে ওঠেনি।'

'কিন্তু এতে করে চাকরি খুইয়ে কী পরমার্থ তারা লাভ করে শুনি?'

'সংসারে অর্থই কি সব?'

'নয়?' মিনতির কথায় নবনীতা যেন কী মজা পাচ্ছে এমনি আদুরে গলায় বললে, 'কিন্তু আপনার স্বামীর চাকরি গেলে আপনি কী করতেন?'

'কী আবার করতাম!' মিনতি হেসে ফেললে।

'তাকে বকতেন না, এমনি অনায়াসে, সামান্য একটা মুখের কথায় চাকরিটা সে খুইয়ে এলো?'

'বকতাম, যদি, যদি তার জন্যে পরে মুখ ভার করে থাকতেন কোনোদিন।'

'কিন্তু আপনার সুখের দিকে সে চাইবে না? তাই বলে ইচ্ছে মতো চাকরিতে সে ইস্তফা দিয়ে আসবে?'

'তিনি যে আমার সুখের চেয়েও আমার সম্মানকে বড়ো করে দেখলেন, সেই তো অসীম সুখী হওয়া।'

'আপনার সম্মান?'

'ওঁর সম্মানের বাইরে অবিশ্যি সেটার কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। কেননা আমার এমন কোনো সম্মান থাকতে পারে না যা আমার স্বামীর অসম্মান দিয়ে কিনতে হবে।'

'চাকরি গেলে নিশ্চয়ই তো আপনারা কষ্টে পড়তেন।' নবনীতার প্রশ্নটা কেমন অনাবৃত।

'তা পড়তুম বই কি।'

'তবে আপনাকে কি এমনি অনাহূত কষ্টে ফেলবার জন্যেই উনি বিয়ে করেছেন নাকি?'

'বিয়ের আগে তেমন কোনো একটা চুক্তি করে নিয়েছি বলে তো মনে হয় না।'

'কিন্তু উনি যখন বিয়ে করেছেন, তখন আপনাকে কি ওঁর সুখী রাখা উচিত নয়?'

'সুখে কি কেউ কাউকে রাখতে পারে—সুখী নিজেকে হতে হয় নিজের থেকে।'

'তবে আপনি বলতে চান সেই কষ্টেও আপনি সুখী হতেন?'

'বলতে পারি না,' মিনতি পাখির মতো অবাধ গলায় বলে উঠলো: 'কেননা সেই কষ্টে এখনো পড়িনি। ধরুন আমার যা অবস্থা, তাতে আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হতো, কিন্তু দেখুন, আমি কেমন সুখে আছি। যদি এর চেয়েও কষ্টে গিয়ে পড়তুম, তো এই ভেবে সুখী হতুম যে এরো চেয়ে আরো কষ্টে এসে পড়িনি।'

নবনীতা মিনতির মুখের দিকে চেয়ে রইলো, শান্ত, সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে। পাতলা আর পরিচ্ছন্ন, ভারি ঠাণ্ডা মেয়েটি, অতীতের বিস্মৃতির মতো। তার কপালটি ভারি স্বচ্ছ, চুলের ভাঙা-ভাঙা গুচ্ছ এসে পড়েছে, কোনো জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের জ্বালা নেই, নীল, অতল বিস্ময় দিয়ে তৈরি। জীবনের কাছে তার ভঙ্গিটা সমর্পণের ভঙ্গি, সন্দেহের নয়। যা সে পেয়েছে তাই যেন তার অনেক। যা সে পায়নি তাই যেন সংসারেই কোথাও নেই। তাকে যেন কেমন একটু শীর্ণ, শ্রান্ত দেখাচ্ছে—সেই শ্রান্তি যেন তার তপস্যার শীর্ণতা। দিন-রাত্রি কার জন্যে যেন সে তার শরীর ঢেলে দিচ্ছে বর্ষমাণ অজস্রতায়, উচ্ছ্রিত

হয়ে পড়ছে প্রার্থনার স্তবের মতো। ঘোষণা নয়, যেন একটা নিবেদন, তার এই শরীর। করুণ দুখানি হাতে পেলব একটি সেবা রয়েছে স্তব্ধ হয়ে, মুখের হাসিটি যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেমন রাত্রির পক্ষে অন্ধকার। নবনীতার সাধ্যি নেই সে-হাসি সে মুছে ফেলে।

কে জানে কেন এই মেয়েটির প্রতি সে অদৃশ্য বন্ধুতায় যেন আকৃষ্ট হয়ে এলো। তাদের যে সে সর্বনাশ করেনি তার এই ঔদার্যের প্রতিদানে সে হয়তো গোড়ায় এই মেয়েটির কাছ থেকে গদগদ কৃতজ্ঞতা কামনা করেছিলো—সেটাই যেন ছিলো আজ তার মহার্ঘ উপঢৌকন, কিন্তু এখন তার মনে হতে লাগলো, মেয়েটির ক্ষণিক এই সঙ্গ আর মধুরতা—এর চেয়ে বড়ো সম্পদ সে আজ আর কিছু কুড়িয়ে নিতে পারতো না।

তক্তপোশের ধারে ঘেঁষে নবনীতা আরো একটু সরে এসে কোমল করে বললে, 'আচ্ছা, আপনি তো আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, আপনাকে আমি যদি তুমি বলে ডাকি; তবে খুব রাগ করো?'

'একটুও না।' মিনতি বরং অবাক হয়ে গেলো, কোনো-কিছু একটা করবার আগে নবনীতা আবার পরের মত প্রার্থনা করে!

'আচ্ছা,' নবনীতা যেন একটা মোহের ভিতর থেকে বললে, 'কষ্টকে তুমি ভয় করো না?'

'তা হলে যে জীবনকেই অস্বীকার করতে হয়। আপনিই বলুন,' মিনতির মুখ অতন্দ্র তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে রইলো : 'দুঃখকে যতো বড়ো করেই না-কেন দেখি, জীবন কি তারো চেয়ে বড়ো নয়?'

'তুমি এত কথা কোথায় শিখলে বলো তো?' নবনীতা এগিয়ে এসে মিনতির একখানা হাত ধরলো।

'বই আমি পড়িনি কিছু।' মিনতি হাসলো।

'ও-কথা লেখাও নেই বইয়ে। থাকলেও হয়তো মুখস্ত করা যায়, শেখা যায় না। কে শেখালো বলো না?'

'আমার ভালোবাসা।' এমন পবিত্র ও সুন্দর দেখালো মিনতিকে।

'আমাকে শিগগির এক গ্লাশ ঠান্ডা জল দিতে পারো, মিনতি?' নবনীতা যেন তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আজ যেন নবনীতা বুঝতে পারলো, তার সামনে এলেই নিশীথ কেন এক গ্লাশ ঠান্ডা জল চাইতো।

'তা দিচ্ছি, কিন্তু,' মিনতি নেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?'

'ঐ যে।' বেড়ার গায়ে কাঠি-দিয়ে-টাঙানো পেন্সিলে-আঁকা একটা ছবির দিকে সে আঙুল তুললে।

'কী মুশকিল, ছবিটা আবার ঘটা করে এখানে টানিয়ে রেখেছে।'

'ছিঁড়ো না, তলায় নাম না থাকলে ওটাকে কেউ তোমার হাঁ বলে মনে করতো না। কে এঁকেছে ওটা?'

'আর-কে!'

'উনি আবার ছবি আঁকতে শিখলেন কবে?'

'ছাই শিখেছেন, আমাকে একলা পেয়ে শুধু খেপানো। আজ হয়েছিলো কি, সকালবেলা বড্ডো বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জানতেও পারিনি কখন উনি নিজে স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করে টেবিল সাজিয়ে বসেছেন। আমাকে যখন ডাকলেন, তখন, কী লজ্জা, এক-গা রোদ উঠে গেছে। অপরাধের মধ্যে চায়ের টেবিলে বসে মস্ত-মস্ত হাই তুলেছিলুম গোটা কতক। তারি একটাকে অমর করে রাখবার ওঁর ভারি সাধ গিয়েছিলো। আমাকে খেপাবার জন্যে, দেখুন দেখি কান্ড, আমার মুখটা একেবারে একটা জাহাজ-গেলা তিমি-মাছের মতন করে এঁকেছেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি আঁকতে পারি না, তা হলে দেখে নিতাম—'

'কী আঁকতে তবে?'

'উনি যখন হাঁচেন, মুখখানা কী তাঁর অপরূপ হয়ে ওঠে।'

'ও-রকম খারাপ করেও আঁকতে পারো না?'

'তাই তো ভয়।' মিনতি হেসে ফেললো : 'আমার কেবলি মনে হয়, ওঁর মুখ আঁকতে গেলে আশানুরূপ খারাপ করে আঁকতে পারবো না।' কী আশ্চর্য, মিনতি চঞ্চলতায় চলকে পড়লো চারদিকে : 'আপনি আমার কাছে জল চেয়েছিলেন না? ভুলে গেছি।'

'আমিও ভুলে গেছি।'

'তার চেয়ে আপনাকে দুটো ডাব কেটে দিই।'

'না।' নবনীতা চেঁচিয়ে উঠলো : 'জল, জল চাই, ঠাণ্ডা, শাদা জল।'

ফুল-কাটা কালো কুঁজোর থেকে গড়িয়ে কাচের গ্লাশে করে মিনতি জল নিয়ে এলো।

নবনীতা তা এক চুমুকে নিঃশেষে খেয়ে ফেললো, যেমন করে নিশীথকে নিঃশেষে পান করেছে মিনতি। আঁচলে মুখ মুছে সে বললে, 'আমি আর বসবো না, তোমার কাজের অনেক ক্ষতি করে দিলুম।'

'আপনারই কাজের ক্ষতি হচ্ছে বলুন! আমার আবার কাজ! শুধু সময় কাটাবার ফন্দি। গান গাইতে তো পারি না, তাই আপন মনে শুধু কাজ করে যাই।'

'তোমার এখনো বুঝি কিছু ছেলে-পিলে হয়নি?'

নিঃশব্দ লজ্জায় মিনতির মুখ ভরে গেলো।

'এর পর তুমি কী করতে, মিনতি?' নবনীতা যেন এক নতুন পৃথিবীতে এসে পড়েছে।

'এর পর নয়, এর আরো অনেক পর উঠে রোদ্দুর থেকে কাপড়গুলো ঘরে আনতুম, ঘর-ঝাঁট দিতুম। না, বিছানাটা এখন পাততুম না, চুল বাঁধতুম, আর পাঁচটা বাজো-বাজো হলে স্টোভ ধরিয়ে কিছু খাবার তৈরি করে রাখতুম।' মিনতি হাতের একটা হালকা ভঙ্গি করলো : 'এই তো কাজের নমুনা, ব্যস্, ফুরিয়ে গেলো।'

'মানে, তোমার একলা থাকা, তার পরই নিশীথবাবু ফিরলেন। এখন ক'টা বাজে?'

কুলুঙ্গিতে ছোট টাইম-পিসটির দিকে তাকিয়ে মিনতি বললে, 'প্রায় সাড়ে তিনটে।'

'তুমি কী আশ্চর্য মেয়ে মিনতি, সাড়ে-তিনটে বাজে, আর তুমি কিনা আমাকে এখনো এক পেয়ালা চা দিচ্ছ না?'

মিনতি স্তম্ভিতের মতো বললে, 'চা খাবেন আপনি?'

'যা চাই তা জোর করেই চাই বলে তোমার হাতের চা-ও কি আমাকে তোমারই হাত থেকে জোর করে কেড়ে খেতে হবে?'

'দিচ্ছি।' নিঃশব্দ হাসিতে মিনতি ঝলমল করে উঠলো; বললে, 'কিন্তু আমাদের চা-টা খুব ভালো নয়, দামী নয়।'

'কিন্তু আমার খাওয়াটা তো দামী।' নবনীতা উঠে দাঁড়ালো তার বলীয়ান দৃঢ়তায় : 'কই, তোমার স্টোভ কই?'

'আপনি বসুন, আমি করে এনে দিচ্ছি।'

'তোমার বুদ্ধিকে বিশেষ প্রশংসা করতে পারছি না, মিনতি। আমি একা-একা এখানে বসে তোমার ঐ ছবির মতো মস্ত-মস্ত হাই তুলবো, যদিও আমার অমর হয়ে থাকবার সম্ভাবনাটা নেই বললেই হয়—আর তুমি কোন চুলোয় বসে চা তৈরি করবে, এমন কথা কোথাও লেখা নেই।' নবনীতা মিনতির একখানা হাত চেপে ধরলো : 'চলো, কোথায় তোমার স্টোভ?'

'এই দিকে।'

দরজার একটি ধাঁধা পেরিয়ে মিনতি তাকে নিয়ে এলো পাশের ছোট ঘরে।

'এটা তোমার ভাঁড়ার?' যে-দিকে চোখ ফেরায় নবনীতার বিস্ময় আর ধরে না। যেন সে সমুদ্রের অতল অদৃশ্য কোন রহস্যপুরীতে এসে পড়েছে। বললে, 'থাকে-থাকে এতো সব শিশি-বোতল, কৌটো-বাটি, হাঁড়ি-কুঁড়ি কোত্থেকে যোগাড় করলে, মিনতি? ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারো?'

'কোথেকে আবার! কিনলুম মাখন, থেকে গেলো কৌটোটা; কিনলুম তেল, শিশিতে আবার সেই তেলই রইলো।'

'আমার সব লুট করে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে মিনতি।'

'এই সব কৌটো আর শিশি?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে এতে কত না-জানি ঐশ্বর্য রয়েছে।' ছিপি আর কাপ খুলে-খুলে নবনীতা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো : 'এটার মধ্যে কি? কালো-জিরে। এটার মধ্যে? পোস্ত। এটায়? কাটা-সুপুরি। এটায়—এটার মধ্যে কি, মিনতি?'

'কত নম্বর?' স্টোভ পাম্প করতে-করতে মিনতি জিগগেস করলে।

'তুমি আবার কৌটোগুলিতে লেবেল এঁটে নম্বর লিখে রেখেছ দেখছি। এটা উনিশ নম্বর।'

'উনিশ নম্বর?' মিনতির সব মুখস্ত : 'উনিশ নম্বরে ইসবগুল।'

নবনীতা মুগ্ধের মতো সমস্ত-কিছুর ঘ্রাণ নিতে লাগলো।

'পৃথিবীতে কতো রকম ডাল হয়, মিনতি?'

মিনতি হাসলো : 'সবই রাখতে হয় কিছু-কিছু। এ-বেলা যেটা হবে ও-বেলা সেটা ওঁর মুখে রুচবে না।'

'এটার মধ্যে ময়দা।' নবনীতা যেন শাসনের সুরে বললে, 'তোমার কী আক্কেল, মিনতি? স্টোভ ধরিয়ে আগেই চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছ। তুমি কি আমাকে শুধু শুকনো এক কাপ চা-ই খেতে দেবে নাকি?'

'দুখানা নিমকি ভেজে দেবো? খাবেন?' মিনতি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'তোমার আতিথ্যকে বলিহারি, মিনতি।'

'বসুন, করে দিই।' মিনতি থালায় করে ময়দা নিলে।

'কী সর্বনাশ! এত ময়দা খাবে কে?'

'যখন করছিই, ওঁর ভাগটাও নিয়ে রাখলাম।' মিনতি হাসি-মুখে

বললে, 'বেলে লেচি করে রেখে দিই, উনি এলে ওঁরটা গরম-গরম ভেজে দেয়া যাবে।'

থালাটা তার হাত থেকে সটান কেড়ে নিয়ে নবনীতা মেঝের উপর লুটিয়ে বসে পড়লো। বললে, 'ঘি আনো, আমিই মেখে দি ময়দাটা।'

'সে কী?' মিনতি যেন মূর্তিমতী পঙ্গুতা।

'আমার এই মাটিতে বসে পড়ায় ধরণী অপবিত্র হয়নি। দাও, ঘি দাও। একটু নুন।'

'কিন্তু আপনার শাড়িটা যে মাটি হয়ে গেলো।'

'আমার এতো বেশি শাড়ি, মিনতি, এই আমার দুঃখ যে একটাও মাটি হয় না।' নবনীতা বিশীর্ণ একটু হাসলো : 'তোমাকে বলতে কি, কে জানে, হয়তো এই শাড়িটাই আমি ধোয়াবো না, বাক্সে তুলে রাখবো, কেননা শাড়িটা ময়লা হতে দেখে ধোবা অস্বাভাবিক অবাক হয়ে যাবে। সেটাতে আমার সম্মানে ঘা পড়বে যে। কী, দাঁড়িয়ে রইলে কি পুতুলের মতো? মাল-মশলা নিয়ে আমাকে সাহায্য করো—আমি জানি কোথায় কী আছে? তুমি এমন একখানা ভাব করছ যে তোমার সমস্ত গেরস্তালি যেন আমি কেড়ে নিয়েছি।'

নবনীতা ভাঁজের পর ভাঁজ বেলে দিতে লাগলো আর মিনতি ভাজতে লাগলো হাতায় করে।

নবনীতা বললে, 'আচ্ছা, এমন সময় নিশীথবাবু যদি এসে পড়েন?'

'আমার ভয় হচ্ছে,' মিনতি হেসে উঠলো : 'অজ্ঞান হয়ে না পড়ে যান মেঝের উপর।'

'কী সর্বনাশ! আমার খাওয়াটাই তবে মাঠে মারা যাবার যোগাড়। তাড়াতাড়ি তবে সেরে নিতে হয়, মিনতি।' বাকি লেচিগুলির দিকে লক্ষ্য করে নবনীতা বললে, 'এগুলি তো এখন এমনি থাকবে, না?'

'হ্যাঁ, উনি এলে গরম-গরম ভেজে দেবো।'

'দিয়ো যেন।' নবনীতার দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ।

মিনতিকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে সে সানুষঙ্গ চা খেলো। মিনতি প্রথমে আপত্তি তুলেছিলো, বলেছিলো : 'উনি ফিরলেই আমি খাবো-'খন।' তার উত্তরে নবনীতা বলেছিলো : 'তোমার যেমন তাঁর সঙ্গে খাওয়ার লোভ, আমারও তেমনি তোমার সঙ্গে। অতএব তোমার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে আমাকে তাঁর সঙ্গে খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বেজে যাক তবে পাঁচটা।'

অগত্যা মিনতি আর আপত্তি করেনি।

চা খেয়ে অনেক পরে বিদায় নিয়ে যাবার মুখে নবনীতা বললে, 'যেখানেই আসি, সেখান থেকেই কিছু-না-কিছু নিয়ে যাই, মিনতি। তুমি কী দেবে?'

মিনতি আর এতটুকুও ভয় পেলো না। বরং কাছে সরে এসে বললে, 'আপনার খুশি। শুধু ঐ আমার হাই-তোলা বিকট ছবিটা ছাড়া।'

'না, ওটা আমি তোমাকে দিতে বলবো না।'

স্তব্ধতায় মিনতি আরো যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

হাত বাড়িয়ে নবনীতা তাকে স্পর্শ করলে। বললে, 'আর কিছু নয়, শুধু তোমার এই ভালোবাসা।'

মিনতি কিছু বুঝলো বা অনেক কিছু বুঝলো না এমনি শূন্য দৃষ্টিতে নবনীতার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। যতক্ষণ না সে শেষ বাঁক নিলে।

নিশীথ বাড়ি ফিরে এলেও অনেকক্ষণ সে ভাঙতে পারলো না কথাটা। স্বাভাবিকতার অনুপাতে ব্যাপারটা আয়ত্ত করতেই তার অসম্ভব দেরি হচ্ছিলো। কোথা দিয়ে কি করে যে পূর্বাপর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় সে ভেবে পাচ্ছিলো না। দিব্যি মাটির উপর বিস্তৃত হয়ে বসলো, মিনতি খেতে দেয় কি না দেয় তার জন্যে অপেক্ষা করলো না। আশ্চর্য, কী সুন্দর তাকে মানিয়েছিলো এই সহজ ঘরোয়াপনায়, দুপুরের এই নিঃসঙ্গ সুষুপ্তিতে, স্বতস্ফূর্ত ও সাবলীল। মানিয়েছিলো তাকে

শাড়ির শান্ত শুভ্রতায়, নিতান্ত শাদাসিধে সাধারণ কথায় ও হাসিতে : ঘোমটাটি তার কাঁধের উপর খসে পড়েছে, শাড়ির পাড়টা বাহুর তলা দিয়ে নেমে এসেছে বুকের ধার ঘেঁষে। কোথাও একটা সেই উদ্ধত পারিপাট্য নেই, শ্রান্তিতে আর প্রতীক্ষায় কেমন শিথিল আর বিষন্ন। মানিয়েছিলো তাকে যখন সে একটু জানলায় এসে বসেছিলো চোখের জলের মতো ঝাপসা দিগন্তের দিকে চেয়ে। যেন কেমন সে একটা পরিচিত পরিমিতি খুঁজে পেয়েছে, ভঙ্গির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, চেনা জুতোতে পা ঢোকানোর মতো। আশ্চর্য, এ মিনতি ভাবতেও পারতো না, নাসিকার সেই উদগ্র চূড়া থেকে অধরের সস্মিত প্রশান্তিতে নেমে আসা। কি করে যে এই অভাবনীয় ঘটে উঠতে পারলো, প্রহারের উদ্যত ভঙ্গি থেকে বন্ধুতায় এই প্রসারণ—এ মিনতির কাছে দুর্বোধ একটা হেঁয়ালির মতো লাগছে।

নিশীথ তখন চা খাচ্ছে, মিনতি কাছে এসে হাসিমুখে বললে, 'তোমাকে একটা আজ অসম্ভব খবর দেবো।'

নিশীথ তার দিকে না তাকিয়েই বললে, 'আমি সমস্ত অপ্রত্যাশিতের জন্যে প্রস্তুত।'

'সে একটা ভীষণ খবর; তুমি তা ভাবতেও পারো না।'

'ভীষণ?' নিশীথ ভয় পেলো বুঝি।

'ভীষণ মানে ভয়ের নয়, মজার।'

'যথা?'

'আমাদের বাড়িতে একজন আজ বেড়াতে এসেছিলো। তার নাম বলো দেখি চেষ্টা করে?'

'তোমার মুন্সেফ-মাসিমা হয়তো।'

'মুন্সেফ-মাসিমার যে দুহাজার টাকা "পাওয়ার" হয়েছে সে-কথা তো কালকেই বলে গেছেন। উনি নয়। আর কেউ। তোমার সাধ্য নেই তা কল্পনা করতে পারো।'

'কে?'

'ম্যানেজার-সাহেবের বউ।'

'কে? নব—নবনী?' নিশীথ বাঁ-হাতে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

'হ্যাঁ, নব-নীতা—নতুন যে এসেছে।'

'বলো কি,' নিশীথ নিজেকে গুটিয়ে গুছিয়ে নিলো : 'কিছু নিয়ে যায়নি তো জোর করে?'

'তার উল্‌টো।' মিনতি বললে, 'বরং দিয়ে গেছে।'

'দিয়ে গেছে! কি?'

'এই যে তুমি খাবার খাচ্ছ এ সে নিজের হাতে গড়ে দিয়ে গেছে।'

'খাবার! এই খাবার বানিয়ে দিতে সে আজ এসেছিলো?' নিশীথের মুখের গ্রাসটা গোল, ভারি, বিস্বাদ হয়ে উঠলো : 'কী সর্বনাশ! এ তুমি করেছ কি, মিনতি?'

'কেন?' মিনতির মুখ শাদা হয়ে গেলো।

'বিষ, আমার খাবারে যে সে বিষ দিতে এসেছিলো।' নিশীথ নাটুকে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো : 'তুমি এটা বুঝলে না, বোকা মেয়ে? আমাকে যে সে মেরে ফেলতে চায়, তাই তো এই সে ষড়যন্ত্র করেছে।'

মিনতি দুই চোখে অকূল অন্ধকার দেখলে। তার সমস্ত শরীর নিমেষে যেন এক আঁটি শুকনো হাড় হয়ে গেলো। হাত বাড়িয়ে কিছু যেন সে আর ধরতে পেলো না। আঁকড়াবার মতো সমস্ত সংসারে কোথাও যেন একটা শক্ত বস্তু নেই।

কিন্তু পর মুহূর্তেই কি ভেবে সে হেসে ফেললো খিলখিল করে। বললে, 'তার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোমাকে মৃত্যুতে এত বড়ো একটা প্রাধান্য দেয়া। ইচ্ছে করলে তো কতো আগেই তোমাকে মারতে পারতো—তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। বরং সে কিনা আজ স্বহস্তে তোমার মুখের গ্রাসই ভরে তুললো। কিছু ভয় নেই তোমার, মারবারই

যদি তার মতলব থাকতো, তবে অনেক আগে আমরাই মরে যেতুম, আমি আর সে, কেননা তারই তৈরি খাবার সবার আগে আমরা খেয়েছি।'

'তুমিও খেয়েছ?'

'অনেকগুলো। আর সশরীরে দিব্যি বেঁচে আছি।' মিনতি স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো বাহু ঘিরে। বললে, 'কোথায় যেন এর একটা গোপন রহস্য আছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো মানুষের জীবনেরই এ একটা আদিমতম রহস্য, জলের নিচেকার প্রথম মাটির মতো। আসলে সব মানুষই সমান, তার হাড়ের নিচে যে হৃদয়। কেবল বাইরে থেকে চামড়ার যা চাকচিক্য, আলো-বাতাসের তারতম্যে। ও হয়তো খুব রোদে এসে পড়েছে, তাই ওর চামড়াটা কিছু কটা, নইলে আমারই মতো রক্ত ওর লাল, আমারই মতো অশ্রু ওর নোন্‌তা।'

আস্তে-আস্তে বাকি খাবারগুলো নিশীথ খেয়ে ফেললে।

'আত্মহত্যা যে করে, সে ক্ষণকালের জন্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার সেই বিকৃত অবস্থা থেকে তাকে ক্ষণকালের জন্যে মুক্তি দাও, দেখবে তার লজ্জার আর অবধি নেই, দেখবে সে জীবনের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কত তুচ্ছতার জন্যেই লালায়িত।'

নিশীথ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো, বিস্মৃতির ধূসরতায়। বললে, 'এইখানে মেঝের উপর বসেছিলো সে?'

'শুধু তাই? এই দ্যাখ, আমার চুল বেঁধে দিয়েছে পর্যন্ত। এতগুলি সরু বিনুনি করে আমি কোনো দিন চুল বাঁধি?' মিনতি ঘোমটা খসিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো : 'টেনে এমন আঁট করে বেঁধে দিয়েছে যে নিতান্ত একটা খুকির মতন দেখাচ্ছে। বারণ করলুম, ঢিলে করে দিতে বললুম, বলে কি না, এতেই নাকি আমাকে তুমি খুব সুন্দর দেখবে।'

'কিন্তু একেবারে তাকে তোমার মাটির ওপর বসতে দেয়া হয়তো উচিত হয়নি।'

'আমি দিয়েছি নাকি? নিজেই সে বসে পড়লো। কিন্তু, সে বুঝতে

পেরেছে,' মিনতি সাঙ্কেতিক হাসলো : 'এই মাটিই তার প্রায় সিংহাসনের মতো উঁচু।'

'আর আমার টেবিলটাও ঘেঁটেছিলো বুঝি?'

'তুমি এখন আর কিছু লেখ-টেখ কি না দেখছিলো খুঁজে।'

'তুমি বারণ করোনি?' নিশীথ বিরক্তির ভান করলো।

'বারণ শোনবারই মেয়ে কি না সে! তুমি বুঝি জানো না তাকে, এতো-দিনেও বুঝি চেনোনি? কিন্তু,' মিনতি স্নিগ্ধ, একটু-বা ব্যথিত গলায় বললে, 'কিন্তু এত তাকে সহজ আর স্বাভাবিক লাগছিলো যে বারণ করাটাই মনে হচ্ছিলো একটা কৃত্রিমতা। একটুও যেন তাকে চেষ্টা করতে হয়নি, সব কিছুতেই যেন তার প্রাণ পড়ে রয়েছে।'

'তোমাকে কি আর সাধে খুকি বলে গেছে? তুমি যখন মুড়ি খাও, আহা, ওর আর কিছু খাবার জোটেনি; আর বড়লোকের বউ যখন মুড়ি খায়, আহা, দেখেছ, কী উদার!' নিশীথ ধমকে উঠলো : 'এটা যে কত বড়ো একটা বড়লোকি চাল, তুমি তা বুঝবে কি করে? এ যে আমাদের কতটা ঘেন্না করা, কতটা অপমান করা, আমাদের গরিব অবস্থা দেখে মনে-মনে কতটা যে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া, তা বোঝবার তোমার অন্তর্দৃষ্টি কই? বড়লোক আদর করে কথা বলে গেছে, আর আহ্লাদে একেবারে ঢলে পড়েছ।'

'কক্‌খনো তাই নয়।' পীড়িত মুখে মিনতি ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো : 'যদি তুমি তাকে আজ দেখতে, কখনো তা হলে তুমি তা ভাবতে পারতে না।'

'যদি তাকে দেখতুম।' নিশীথ চারদিকের শূন্যতায় একবার চোখ বুলোলো।

'হ্যাঁ, যখন সে আমার সঙ্গে বসে গল্প করছিলো, খাবার তৈরি করছিলো, চুল বেঁধে দিচ্ছিলো, ঘুরে-ঘুরে দেখছিলো ঘর-দোর। তার ছোট-ছোট হাসি, মিষ্টি-মিষ্টি কথা, এটা-ওটা নিয়ে মৃদু-মৃদু নাড়াচাড়া

—আর সব কিছুতেই অসীম তার সেই আশ্চর্য হয়ে যাওয়া। যদি তুমি তাকে দেখতে!' মিনতি জানলার বাইরে ছায়াচ্ছন্ন মাঠের দিকে চেয়ে বললে, 'আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো কি জানো? বিলেত-দেশটা আগাগোড়া মাটির।'

'কিন্তু কেন যে এলো, মতলবটা কিছু ঠাহর করতে পারলে?'

'কই, না, কী আবার মতলব!'

নিশীথও কিছু ভেবে উঠতে পারলো না। যেমন ভেবে উঠতে পারলো না কেন আবার প্রখর দিনের পর কালো, কোমল অন্ধকার নেমে এসেছে।

কে জানে, হয়তো গভীর একটা ষড়যন্ত্র।

8

[ষোলো]

কিন্তু ভয় নেই, দেবতা জেগে উঠলেন। বহুদিনের পাপ আর গ্লানি, লোভ আর লজ্জা, নির্মল আর নবনীতাকে তিল-তিল করে গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে গ্রাস করে ধরলো। অক্টোপাসের মতো। আর ওরা ছাড়া পেলো না।

বিষাক্ত রক্তেরও একটা মাদকতা আছে, কিন্তু এমন একটা সময়ও নিশ্চয়ই কোথায় আছে, যেখানে রক্ত এসেছে নীল, নিস্তেজ, নির্বাপিত হয়ে।

কোম্পানি ওদের ধরে ফেললে। অনেক চাতুরী, অনেক অত্যাচার—অনেক একেবারে অনাবৃত মুখব্যাদান। নগ্নতার ভূষণই হচ্ছে নির্লজ্জতা। মাটির সমতলতা থেকে পর্বত যতই উপরে উঠতে থাকে, ততই সংকীর্ণ হয়ে আসে তার চূড়া; তবু সে দুরারোহ দুর্গমতায় এসেও তারা থামেনি, আরো উঁচুতে, হয়তো আকাশে তারা পা বাড়িয়েছিলো, সেই শূন্যতাটা পাতালেরই প্রতিবেশী। কেউ তাদের আর আটকাতে পারলো না।

লুকোবে না, কিছুতেই নিশীথ লুকোবে না, উল্লাসে সে অন্ধ হয়ে গেলো। বললে, 'সদরে কমিশান বসেছে মিনু, আমি যাবো সাক্ষী দিতে।'

'সাক্ষী দিতে!' মিনতি গভীর একটা যন্ত্রণার মধ্যে থেকে বললে, 'তোমার কী মাথাব্যথা জিগগেস করি?'

'নেই কিছু?' নিশীথ চোখের কোণায় অস্ফুট ইশারা করলো।

মিনতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গে বললে, 'তোমার মাথাটা এতদিন নিরেট, আস্ত ছিলো বলেই বুঝি এখন ব্যথাটা স্পষ্ট টের পাচ্ছ, না?'

নিশীথকে যেন বিঁধলো। আমতা-আমতা করে বললে, 'কিন্তু সোজা সত্য কথা বলবো, তাতে ভয় বা লজ্জা কিসের? আমি তো ওদের নামে বানিয়ে বলবো না।'

'সত্যের প্রতি তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেম কবে থেকে হলো জিগগেস

করি?' মিনতি ঝাঁজিয়ে উঠলো : 'পরের অনিষ্ট করবার বেলায়ই বুঝি সত্যনিষ্ঠাটা জাগ্রত হয়ে ওঠে! আর নিজের চাকরি নিয়ে যখন টানাটানি, তখন মিথ্যেটা আত্মরক্ষারই অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কী সত্য কথা তুমি বলবে শুনি?'

'যা আমি জানি, তাই।'

'কতোটুকু তুমি জানো? আর যা আমরা জানি, সব সত্য কথাই কি নিঃসংশয়ে বলতে পারি সংসারে?'

'সাহিত্যে হয়তো বলতে পারি না, কিন্তু আদালতে বলতে পারি।' নিশীথ হাসলো।

'সেই মন্দিরের ব্যাপারটা বলবে তো? কিন্তু তোমার গুণধর গঙ্গাধর তার জন্যে দাম পেয়েছে জানো? অন্যায়, অতিরিক্ত দাম। তাও বুঝি তোমার সহ্য হচ্ছে না? কিন্তু মনে রেখো, সেটা গঙ্গাধরের নিজের সম্পত্তি, সে যদি বেচে, তবে ক্রেতা সেটা কিনলো বলেই অপরাধী হবে?'

'তা হলে তুমি বলতে চাও ওরা বাঁচুক, আর আবার ছাড়া পেয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করে দিক?'

'ওরা বাঁচবে কিনা জানি না, কিন্তু ওরা মরুক ঐ কামনার মধ্যেও কোনো মহত্ত্ব নেই।'

'তবে যাবো না সাক্ষী দিতে?'

'সমন দিয়েছে তোমাকে?'

'না।'

'তবে?'

'এমনি। একটা বিরাট পতন দেখবার কৌতূহল।'

'না, তুমি যেতে পাবে না।' মিনতি শক্ত করে নিশীথের হাত চেপে ধরলো : 'একটু কৃতজ্ঞতা শেখ। তোমার কিছুই সে ক্ষতি করেনি।'

'ক্ষতি করেনি?' নিশীথ যেন আর্তনাদ করে উঠলো : 'তুমি তার কী জানো, মিনতি?'

'হয়তো জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, ইচ্ছে করলে আরো তোমার সে ক্ষতি করতে পারতো।'

নিশীথের হৃৎপিন্ডটা যেন কে ঠান্ডা মুঠিতে চেপে ধরলো। তবু সে প্রাণপণে বললে, 'আমার সে কিছুই ক্ষতি করতে পারতো না।'

'তেমনি তুমিও যেটাকে বিরাট একটা পতন বলে মনে করছো, কে জানে, সেইটেই হয়তো জীবনের সমতলতা।'

নিশীথকে মিনতি কিছুতেই ছেড়ে দিলো না, কিন্তু হরবিলাস আছে। আছে তার অক্ষৌহিনী বাহিনী।

শেষকালে কমিশানাররা রায় দিলেন। বিকেলের ট্রেন শহরে এসে পেঁছুবার আগেই খবরটা দিগ্বিদিক রাষ্ট্র হয়ে গেলো।

ইস্কুল থেকে রাত করে বাড়ি ফিরে এসে নিশীথ ব্যাকুল হাতে মিনতির গলা জড়িয়ে ধরলো। গোপন করতে যাওয়া বৃথা, কাপড় চাপা দিয়ে আগুন লুকোনো যায় না, নিশীথ নির্লজ্জ হাসিতে ফেটে পড়লো : 'সংসারে কে কার চাকরি নেয়, মিনতি?'

'বলো কি, চাকরিটা ওর গেলো নাকি সত্যি-সত্যি?' শোকগ্রস্ত শিশুর কণ্ঠে মিনতি ককিয়ে উঠলো।

'এর পরেও চাকরি যাবে না বলতে চাও? এত বঞ্চনা, এত উৎপীড়ন, এত অনাচার—ধর্মের কি এতটুকুও চক্ষুলজ্জা নেই?' নিশীথ উৎসাহে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো : 'আইনের প্যাঁচে ঠিক ফেলা গেলো না হয়তো, কোনো একটা সেকসানের অক্ষরে-অক্ষরে এসে হয়তো মিললো না, জ্বল-জ্যান্ত সাক্ষী-প্রমাণের অভাব, নইলে কোম্পানি ঠিক ওকে জেলে পাঠাতো দেখতে।'

'কিন্তু তার জন্যে চাকরি যাবে?'

'তার চেয়েও অনেক তুচ্ছ কারণে যায়। ওরা এর জন্যে অনেক আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলো। পাহাড়ে উঠেইছিলো ওরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।'

'মিথ্যে কথা। ওদের পিছনে ছিলো একটা গূঢ় ষড়যন্ত্র, শত্রুর লুকোনো ছোরা। ওদের সুখ কারো সহ্য হতো না, ওদের শক্তি, ওদের অধিকার।' মিনতি যেন সম্মুখীন কোনো শত্রুকেই আক্রমণ করলে।

'কিন্তু সকল-কিছুরই একটা সীমা আছে। নগ্নতার পর্যন্ত। কেবল নির্লজ্জতারই কোনো সীমা নেই।'

'এখন তবে ওদের কী হবে?' মিনতি যেন বহুদূর থেকে বললে।

'ভাবতে পাচ্ছি না।' অথচ যা নিশীথ ভাবতে পারছে তাইতেই তার একটা লোলুপ, বন্য প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হচ্ছে। সে-কথা ক্ষণ-কালের জন্যে ভুলে যাবার জন্যে সে বললে, 'তোমার কিছু ভাবনা নেই মিনতি, যা সরিয়েছে, তাতে ওদের এ-জন্মের পাথেয়ের জন্যে কোথাও আর হাত পাততে হবে না। বলেছিই তো, আগেই ওরা আঁচ করতে পেরেছিলো, তাই মোটরটাও এক ফিরিঙ্গি মিশনারির কাছে বেচে দিয়ে গেছে।'

'তবু, বলো কী! জোয়ান, সমর্থ একটা পুরুষমানুষের চাকরি যাওয়া!' মিনতি যেন কিছুতেই অবিসংবাদিত মেনে নিতে পারছে না।

'সেই তো নিষ্ঠুর জেগে-ওঠা, মিনতি।'

'কিন্তু তোমার চাকরি গেলে কেমন হতো জিগগেস করি?'

'এতোক্ষণ ধরে তোমাকে সেই কথাই তো বোঝাচ্ছি। যদি যেতো, সেইদিনও কান পেতে থাকলে এমনি প্রচ্ছন্ন উল্লাস শুনতে পেতে। যে চাকরিটা নিতো, তার : আর পরে যে আসতো, তারো। যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ আমাকে আমার অধিকারের শেষ সীমা পর্যন্ত উঠতে দেবে না কেন?'

'পরের দুঃখে তোমার এমন নির্লজ্জ আনন্দ করবার কখনো কোনো অধিকার নেই।'

মিনতির মুখ বেদনায় করুণ হয়ে এলো।

'আজকের দিনে আছে। চিরকাল ধরে আছে। পরে দুঃখ পাচ্ছে এ

ভেবে সুখী হতে না পারলে আমরা কক্খনো বাঁচতে পারতুম না। তেমনি—'

মিনতি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তেমনি পরে দুঃখ পাচ্ছে এ ভেবে দুঃখী হতে গেলেও আমরা বাঁচতুম না কক্খনো।'

'যাকে ঘৃণা করো,' মিনতি যেন একটা শারীরিক কষ্টের ভিতর থেকে বললে, 'তাকে কি তুমি এমনি করেই অপমান করবে নাকি?'

'নইলে ঘৃণায় আনন্দ পাবো কি করে? তা ছাড়া, অপমান করছি কোথায়, যখন তাকে সত্যি-সত্যি ঘৃণা করছি? কত তাকে এখানে মূল্য দিলুম তা জানো?'

'তারা এখানে আর নেই, না?'

'না। আজ চলে গেলো। নৌকো করে দিব্যি রঙিন পাল তুলে দিয়ে নদীতে।'

'সদর থেকে আবার এসেছিলো নাকি ওখানে?' মিনতি অবাক হয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, এমন-কি রায় বেরিয়ে যাবার পর।'

'কী সাহস!'

'এ শুধু নবনীতাতেই হয়তো সম্ভব—নতুন যে এসেছে।' নিশীথ বললে, 'নইলে ভাবো, এত বড়ো চাকরিটা চুরমার হয়ে গেলো, যার চূড়ার দিকে চেয়ে থাকতে পর্যন্ত চোখ ধাঁধিয়ে যেতো—তা ছাড়া এত কলঙ্ক, এত অপবাদ, এত লাঞ্ছনা—কোনো কিছু সে গ্রাহ্য করলো না। স্বামীকে নিয়ে আবার ফিরে এলো তার বাঙলোয়। তার জিনিসপত্র তখনো নাকি সব গোছানো হয়নি, লোকজনের ওপর তেমনি সেই তম্বি, সেই প্রভুত্ব। মুখে নাকি এতটুকু একটা রেখা পড়েনি। নৌকোয় ওঠবার আগে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দুজনে নাকি নদীতে খুব সাঁতার কেটে নিয়েছে স্ফূর্তি করে।'

'বলো কী?' বিশ্বাস করতেও যেন মিনতির রোমাঞ্চ হচ্ছে।

'হ্যাঁ, কোনো কিছুতেই নাকি ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকে কি বলছে বা না বলছে! কেননা সব সময়েই যখন লোকে বলে থাকে, এখনো না-হয় বলবে। সব সময়েই যখন লোকে ভিড় করে থাকে চারদিকে, এখনো না-হয় করলো। আগে ছিলো না-হয় চক্ষের শূল এখন না-হয় চক্ষের অঞ্জন!' নিশীথ হেসে উঠলো।

'দ্যাখো, কী দুর্ধর্ষ! অপরাজিত।'

'ব্যাঙ্কে অমন মোটা টাকা থাকলে আমিও নিশ্চিন্তে সাঁতার কাটতে পারি।' নিশীথ হাঁফ ছেড়ে বললে, 'যাক, ওরা গেছে, দেশটা যেন জুড়োলো মিনতি।'

'আর তোমার চাকরিটা রইলো অক্ষত।' মিনতি একটু খোঁচা দিলো। বললে, 'কোথায় ওরা গেলো না-জানি।'

'কে তার খবর রাখে? দিনের শেষ প্রান্ত থেকে চলে গেলো তারা রাত্রির অন্ধকারে। সে হয়তো অনেক দূর, মিনতি।'

'আমার এখন তাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে একটিবার।' মিনতি সমবেদনায় গলে গেলো।

'আমারও। কিন্তু এখন নয়, আরো কদিন পরে।'

'আরো কদিন পরে কেন?'

'এখনো তার মুখে নিষ্ঠুর জ্বালা আছে, সূর্য অস্ত যাবার পরেও সন্ধ্যারাগের মতো। গাঢ় অন্ধকার করে আসুক। যদি তখন তাকে সত্যি করে চেনা যায়।'

'ছি,' ঘৃণায মিনতির মুখ যেন বিমর্ষ হযে এলো : 'ওদের দুঃখের দিনে এমন করে মজা দেখছ, কিন্তু চাকা আবার ঘুরে যেতে পারে।'

'আর তা আমার বুকের উপর দিযে। সেই তো সংসারে শেষ অবধারিত সত্য, মিনতি। আমি তো তার জন্যে ওদেরই মতো প্রস্তুত। তুমি অবতারের মতো মাঝের থেকে অমন হিতোপদেশ আওড়িয়ো না তো।'

মিনতি মুখ ভার করে জানালায় গিয়ে বসলো।

একটা হাউই উঠেছিলো আকাশে, বিদীর্ণ-বিচ্ছুরিত দীর্ঘ একটা হাহাকারের মতো; তার বর্ণচ্ছটাময় তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত স্নিগ্ধ, শান্ত, নীল অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

[সতেরো]

বৈকালিক ট্রেনটা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছুলো সদর থেকে, দেখা গেলো ফার্স্টক্লাশ কামরা থেকে নামছে নির্মল আর নবনীতা। সমস্ত স্টেশন এক চোখে তাদের দিকে নিষ্পলক হয়ে রয়েছে।

নির্মলের পোশাকে তবু বা খানিক দরিদ্র রুক্ষতা আছে, ট্রেনে এসেছে বলে যা ধরা যেতে পারে; কিন্তু নবনীতাকে দেখে মনে হয় এই মাত্র যেন সে তার বাথরুমের দরজা খুলে এলো বেরিয়ে। সমস্ত পোশাকে তার একটা রঙিন উন্মাদনা, সেই ঘোরতর ঔদ্ধত্য। আঁচলে উত্তাল উচ্ছৃঙ্খলতা, দ্রুততার দীপ্তিতে সমস্ত শরীর যেন ঝিলকিয়ে উঠছে। ভাঙা কাচের কিনারে রোদের গুঁড়োর মতো। যেন তার কিছুই হয়নি, বা, এমন কিছু একটা হয়েছে, যা শূন্য থেকে প্রাণের উদ্ভবের মতো।

ফটকের বাইরে এসে নির্মল প্রায় ঘুম-ভাঙা গলায় বললে, 'এতটা পথ কি করে যাবে?'

নবনীতা হাসির এক ঝাঁক শাদা পাখি উড়িয়ে দিলে। বললে, 'কি করে আবার! তোমার মোটরটা তো আর নেই।'

নির্মলকে যেন কে দাঁড় করিয়ে দিলো। বললে, 'কতটা রাস্তা তা খেয়াল রাখো?'

'বেশি নয়, মাইল দুই। শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে আমাদের বাঙলো।'

'এত পথ তুমি হাঁটবে?'

'তারো চেয়ে বেশি।' নবনীতা চোখে একটু লোলুপ লাস্য নিয়ে এলো : 'দুচোখ যতদূর যায়।'

'সবায়ের সামনে দিয়ে আমি এমনি করে হেঁটে যেতে পারবো না।' নির্মলের শরীর যেন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে উঠছে।

'সবায়ের সামনে দিয়ে আজই তো হেঁটে যাবার দিন।' নবনীতা নিটোল গলায় বললে, 'জীবনের এমন একটা রোমাঞ্চ তুমি আস্বাদ করবে না?'

'কেন তুমি এ-জায়গায় আবার ফিরে এলে?' পীড়িত, বিরক্ত মুখে নির্মল বললে, 'কি-কতগুলো ছাই জিনিস ফেলে গেছ—'

'ও ছাই জিনিসের জন্যে যে নয় তা তো তুমিই বুঝতে পারছ।' নবনীতা নিস্পৃহ গলায় বললে, 'জিনিস যত বাড়ে, জায়গা তত বাড়ে না, শেষে একদিন দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। আজ একেবারে শূন্য হাত-পা, কী অসীম মুক্তি বলো দেখি।'

নির্মল চোখের সামনে দলা-পাকানো কঠিন একটা অন্ধকার দেখলে। বললে, 'জিনিসের জন্যে নয় তো এখানে এলে কি করতে?' নির্মল দাঁড়িয়ে পড়লো।

'জায়গাটা একবার দেখতে। মরবার পর মানুষ যেমন শেষ পৃথিবীকে দেখে।' নবনীতা স্বামীকে ধীরে আকর্ষণ করলো : 'চলে এসো, আমরা জয়ী।'

'জয়ী?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধে আমরা জায়গা পাইনি, জিনিস পাইনি, না-ই পেলুম, কিন্তু জীবন পেয়েছি—সেই আমাদের প্রকাণ্ড। ভয় কিসের, চলে এসো।'

নির্মল শামুকের মতো গুটিয়ে উঠলো। বললে, 'ঘুর-পথে নদীর ধার দিয়ে চলো, নৌকো করে বাড়ি পালাই।'

'আর আমরা পালাবো না, মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবো,' কথার তাপে নবনীতার মুখ উষ্ণ হয়ে উঠলো : 'ঘরের মধ্যেই তোমার ভয় আর লজ্জা, যতক্ষণ তুমি দেয়াল দিয়ে জীবনকে রেখেছ আড়াল করে, পোশাক দিয়ে যেমন তোমার শরীর, কিন্তু বাইরে, যেখানে কোথাও তোমার তীর নেই, শেকড় নেই—বিশাল এই উন্মুক্তি—এ তোমার কাছে একটা অসহ্য উল্লাস বলে মনে হয় না?'

আরো কয়েক পা এগিয়ে নির্মল বললে, 'আর নয়। পথে অনেক চেনা লোক।'

নবনীতা বললে, 'কেউ কারুর চেনা নয়, সংসারে। খালি পথ আর পথ।'

'কে কি ভাববে!'

নবনীতা রাস্তার মাঝেই অবাধ হেসে উঠলো : 'কিন্তু আমরা কি ভাবছি সেইটেই বড়ো কথা। আমরা ভাবছি জীবনটা কি মজার, কী অদ্ভুত মজার—কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম, আবার কোথায় না-জানি যাব! আমার তো গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে।'

নির্মল তার দিকে অসহায় দৃষ্টি ফেললে।

ঢালু মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা, বসতিবিরল। দিনের অবসাদ মাঠের উপর প্রসারিত হয়ে পড়েছে সবুজ শান্তিতে। দুজনের মাঝখানে নরম নীরবতা। নবনীতা কুহকময়, তরল গলায় বললে, 'তুমি এমন একখানা চেহারা করে আছ যেন ডুবো জাহাজের খালাসী। যেন তোমার কী ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'হয়নি?'

'না। এ তো বরং একটা অন্ধ আনন্দ, নিশ্চিন্ত, নিরাবরণ। একে মেনে নিতে তোমার এত কৃপণতা কেন?' নবনীতা স্বামীর বাহুতে ঈষৎ আশ্লিষ্ট হয়ে এলো : 'এ আঘাত তোমাকে কে বললে, এ তো একটা রোমাঞ্চ, গভীর, আত্মার মূল পর্যন্ত।'

ততক্ষণে তারা লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়েছে। কেউই ভাবতে পারতো না, তারা এখন এখানে, অসময়ে! খবর যারা পায়নি তারা চমকে উঠলো, খবর যারা পেয়েছে, তারাও। কেউ ভয়ে, কেউ বিস্ময়ে। জানলায় ও বেড়ার পাশে মেয়ের দল যতদূর সম্ভব আব্রু বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব দুচোখে তাদের অনুসরণ করতে লাগলো। খবরটা যারা জানতো তারাও যেন আর সহসা বিশ্বাস করতে চাইলো না—এমন একটা সর্বনাশের পরেও যে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে শহরের মধ্য দিয়ে সোজা চলে যেতে পারে এ প্রায় একটা অমানুষিকতা। আর দ্যাখো না, সেই তেজ, সেই নাক উঁচু করে চলা। সেজেছে, যেন নতুন করে বিয়ে হচ্ছে। এখনো কী হাসি, যেন ভূমিকম্পে তার মজবুত গাঁথনি থেকে একখানাও ইট খসেনি।

দুজনে পা মেপে-মেপে শহরের বর্তমান জলবায়ু নিয়ে কথা বলতে-বলতে এগোতে লাগলো। দর্শকের দল চিরকাল পিছনেই থাকে পড়ে।

নবনীতা হঠাৎ থেমে পড়লো, বললে, 'মুন্সেফ-মাসিমা।'

ছোট একটা ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে তাঁর স্বামী কপালের উপর চশমা তুলে অমৃতবাজারের 'নিউজ ফ্রম্ মফস্বিল' পড়ছেন, আর মাসিমা পাশে দাঁড়িয়ে আর্দালিকে শাসাচ্ছেন কি নিয়ে, ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন।

'নমস্কার, মাসিমা।' রাস্তা থেকেই নবনীতা উচ্চ সম্ভাষণ করলে।

নির্মল বললে, 'তুমি যাবে নাকি ও-বাড়ি?'

'চলো না। আমার আজ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সবাইকে জানিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে আমি আজো সেই তেমনিই আছি। না-থাকাটাই তো হার।'

'আমি পারবো না, পারবো না কিছুতেই।'

স্বামীর এই আর্তিতে নবনীতার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

তাদের সসম্ভ্রম আহ্বান করবার জন্যে মাসিমা রাস্তার দিকে কয়েক পা নেমে এসেছেন। গলাটা কৌতূহলে ভিজিয়ে মাসিমা জিগগেস করলেন, 'এলেন কবে?'

'এক্ষুনি।'

'কী হলো সেই ব্যাপার?'

'কী আবার হবে!' নবনীতা নির্মল হেসে উঠলো : 'ছাড়া পেয়েছি।'

মাসিমা যেন শূন্য থেকে গোল হয়ে মাটির উপর বসে পড়লেন। বলে কি!

'জানেনই তো এখানকার ট্রেন, বাড়ি গিয়ে এখন আরেকবার স্নান না করলে শরীরটা সুস্থ হবে না—অনেক দূর যেতে হবে। নমস্কার।'

নবনীতা কেটে পড়লো।

দ্রুত হেঁটে ধরে ফেললো স্বামীকে। বললে, 'তুমি যখন একা থাক, কেমন তোমাকে দুর্বল, দুঃখী মনে হয়; আর আমি যখন এই পাশে এসে দাঁড়াই, তোমাকে দেখায় বীর, বিশ্বজয়ী।'

তারপর তারা যখন তাদের বাঙলোয় এসে পৌঁছুলো, নদীর জল প্রায় কালো হয়ে এসেছে। নৌকোটা তৈরি করে নিতে বেশিক্ষণ লাগবার কথা নয়, ততোক্ষণে স্নান করে নিলে মন্দ হয় না। একটা বহুলপল্লবিত গাছের তলায় এসে নবনীতা বসলো, একে-একে তার পোশাকের পীড়া লঘু করে আনলে। ছোট-ছোট ঢেউয়ে ধারালো নদী ফুলে-ফুলে উঠছে। নবনীতা চুলগুলি পিঠের উপর ভেঙে ফেললে—কোনো বন্ধনই যেন সে আর রাখতে চায় না—তারপর ধীরে-ধীরে নেমে আসতে লাগলো জলের গভীরতর শীতলতায়। কী অবাধ মুক্তি এই জলে, কোনো দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, আঁকাবাঁকা অবারিত রেখায় নিজেকে বয়ে নিয়ে চলেছে। নবনীতা দুই শুভ্র পা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে জলে সাঁতার কাটতে লাগলো।

জলের আলোড়ন শুনে নির্মল পাড়ে এসে দাঁড়ালো।

জলের থেকে শুভ্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে নবনীতা ডাকলে : 'নেমে এসো।'

জলের তলায় নবনীতাকে কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন সামুদ্রিক শাদা একটা ফুল, বৃন্তহীন। ভেজা চুল গলা জড়িয়ে রয়েছে, ভেজা চোখের পালকগুলি চিকমিক করছে কণা-কণা জলে, তার ভিতরে হাস্যস্ফুরিত দৃষ্টিটি কেমন আর্দ্র। নির্মল তাড়াতাড়ি তার গায়ের জামাটা একটানে খুলে ফেললে।

'আমাকে ধরো দিকি।' নবনীতা গভীর একটা ডুব দিলো।

উড়ন্ত পাখির মতো ছুটে গিয়ে নির্মল তাকে বাহুর বেষ্টনে ধরে ফেললে। জল ছিটিয়ে নবনীতা অনর্গল হেসে উঠলো; বললে, 'জাহাজ ডুবেছে বটে, কিন্তু আমরা জলে পড়িনি।'

দিনের বেলার শুকনো চাঁদ ততোক্ষণে ভরে উঠেছে। নৌকো তৈরি, ফুলিয়ে দিয়েছে রঙিন পাল। ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে পাটাতনে বসে নবনীতা চা করছে, ঘুরিয়ে দিয়েছে গ্রামোফোন, নির্মল বসেছে হালে, সার্টের কলারটা উড়ছে বাতাসে।

নবনীতা বললে, 'এবার ছেড়ে দাও।'

[আঠেরো]

অন্য লোকে ভুলতে পারে, কিন্তু নিশীথ ভোলেনি।

সেই উগ্র, উত্তপ্ত উল্লাস সে তার রক্তের মধ্যে মদির একটা নেশার মতো বহু বৎসর ধরে লালন করে এসেছে। যতদিনে না—

শুধু সেই কথাটাই এখন বলা বাকি।

পুজোর ছুটিতে নিশীথ সপরিবার কলকাতা এসেছে বেড়াতে, আর সম্প্রতি হরতোকীবাগানের বাসা থেকে সন্নিকট হেদোতে এসেছে একা। গ্যাস-জ্বলোজ্বলো সন্ধ্যা, কতগুলো ছেলে জলে হুটোপুটি করছে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন জনতা এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তাদেরই ভিতর থেকে নিশীথ সামনে দেখতে পেলো, আর কেউ নয়, নির্মল। সাধারণ কথোপকথনের স্বরে ডাকলে শোনা যায়, মাত্র এতোটুকু দূরে দাঁড়িয়ে সে পুষ্করিণীর জল দেখছে।

তাকে বিশ্বাস করতো না নিশীথ নির্মল বলে, যদি না সে নিশীথকে দেখে রুমালে মুখ ঢেকে সরে পড়ার দ্রুত চেষ্টা করতো।

বলা বাহুল্য, নিশীথও তার পিছু নিলো।

আজো যেন তাকে অন্ধ একটা প্রতিহিংসা ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরে এমনি শুধু একটা নিঃস্বার্থ কৌতূহল, কিন্তু তার গহনতম মনের অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে ছোট-ছোট আগুনের জিহ্বা। নির্মল যে তাকে দেখে আজ আর পিছন ফিরে রুখে দাঁড়াতে পারলো না, বরং পালিয়ে যাচ্ছে ইঁদুরের মতো, এর চেয়ে ভাগ্যের রসিকতা আর কী হতে পারে? কত দূর যায়, আবার চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নেয় সত্যি কেউ তার পিছনে আসছে কি না। সমস্ত সংসারের চোখে যেন সে আজ ধরা পড়ে গেছে, নির্লজ্জতার সেই অপরিসীম ঐশ্বর্যের এক কণারও সে আজ অধিকারী নয়। পৃথিবীকে সম্ভাষণ করবার যেন আর তার ভাষা নেই, নেই সেই দৃপ্ত সম্মুখীনতা। পিঠ কুঁজো করে সে পালাচ্ছে। নিশীথের চোখের থেকে মুছে যাবার জন্যে সে ব্যস্ত, অথচ এতখানি রাস্তার মধ্যে একবার একটা সে গাড়িতে চড়ে বসতে পারলো না। জোরে চলতে গিয়ে একবার সে হোঁচট খেয়ে পড়লো, পায়ের স্যাণ্ডেলের একটা স্ট্রাপ গেল ছিঁড়ে, আর পকেট থেকে দাগ-কাটা ওষুধের একটা শিশি পড়লো ফুটপাতের উপর ছিটকে। যেটুকু ওষুধ তখনো অবশিষ্ট আছে তাতেই সে সযত্নে ছিপি আঁটলো, আর রাস্তা থেকে একটা ইঁট কুড়িয়ে জুতোটা বসলো ঠুকতে।

নিশীথ দেখলো এত বড়ো দুটো রূঢ় প্রয়োজনীয়তার কাছে, তার কাছে তার ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

নিশীথের ইচ্ছে হলো একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও পরিচিত, স্মিত মুখে তাকে স্নিগ্ধ অভিবাদন করে। আর একবার কান পেতে শোনে সমস্ত শূন্য থেকে ভাগ্য কেমন শত-লক্ষ হাতে অজস্র করতালি দিয়ে উঠেছে।

কিন্তু ভাবতেই নিশীথের বুকটা যেন দমে এতটুকু হয়ে গেলো। কে এই নির্মল, ভুল তার মাঝে সেই পুরোনো নির্মলের ব্যক্তিত্ব টেনে আনা, সে-নির্মল মরে গেছে—এই জন্মেই মানুষের কতবার মৃত্যু ঘটে; এ নির্মল হচ্ছে বিরাট আকাশের নিচে চিরন্তন, নিঃসঙ্গ, পরিচয়হীন একটি মানুষ।

তাই নিশীথ একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে তাতে চেপে বসলো, আর নির্মলেরই প্রতি সম্ভ্রমে বলতে পারো, হুডটা দিলো তুলে।

কে কবে ভাবতে পারতো নির্মল আনাচে-কানাচে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর পিছন থেকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কিনা নিশীথ!

ভুল তার মাঝে সেই পুরাতন ধারাবাহিকতা খোঁজা; সে সদ্যস্তন, সে পৃথক, সে বিচ্ছিন্ন।

ভদ্রলোকের মতো নিশীথ তার নিজের কাজে চলে গেছে মনে করে নির্মল নিশ্চিন্ত মন্থরতায় পথ ভাঙতে লাগলো। নিশীথ দেখলে, এতখানি দীর্ঘ পথ তাকে পায়ে হেঁটেই আসতে হচ্ছে, বাস্ বা ট্র্যাম-গুলি তাকে লক্ষ্য করলেও সে উদাসীন। একটা পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো কখানা সে বিস্কুট কিনলো, রুমালে করে নিলো বেঁধে। ফালি একটা চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সে ইতস্তত করলো, ভিতরে ঢুকবে কিনা। দেখা গেলো একটা প্রচণ্ড দুর্লোভ সে দমন করলে।

গলিঘুঁজির সর্পিল কুণ্ডলী পেরিয়ে যে-গলিটাতে সে এসে ঢুকলো, আধুনিক সাহিত্যে আমরা তার অনেক চেহারা দেখেছি। কিন্তু সাহিত্য জীবনকে খানিকটা ভয় করে, অস্বীকার করে, রমণীয়তাই তার লক্ষ্য

বলে জীবনের থেকে সন্তর্পণে দূরে সরে আসে। চুপি-চুপি গলির মুখে যখন রিক্‌সা থেকে নিশীথ নামলো, সন্দেহ হলো সশরীরে সেখানে ঢুকতে পারবে কিনা, কিম্বা এ অন্ধকার সুড়ঙ দিয়ে যেখানে গিয়ে পেঁছুবে, সেখানেও মানুষের নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ আছে!

তখন নির্মলের নিশীথকে স্পষ্ট চেনবার কথা, গলির মুখে গ্যাসের আলো এসে পড়েছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে কেউ তোমাকে অকারণ অনুসরণ করছে জানতে পেরে তোমার যে একটা ন্যায্য প্রতিবাদ করবার কথা, এতটুকু শক্তি পর্যন্ত তার নেই।

দেখা গেলো, সঙ্কীর্ণ একটা দরজার ফোকর দিয়ে নির্মল কোথায় নিশ্চিন্ত অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সেই দরজার আড়ালে আর যেন কে আছে! তাকে কি একবার দেখা যায় না? দেখা যায় না তাকে সত্যি এখন মানিয়েছে কি না? তার ভঙ্গিটা কেমন দুর্বলতায় নমিত হয়ে এসেছে, কপালে ক্লান্তি, অধরের কিনারে গভীর হয়ে ফুটেছে ট্র্যাজেডির একটি রেখা! সে কি আজও উদাসীনতার তুষার দিয়ে তৈরি? আজও কি রুক্ষ মরুভূমিতে করুণ একটি অশ্রুর ধারা নেমে আসেনি?

সেই দরজার পাশ দিয়ে তার পর দুপুরে-বিকেলে বহুবার নিশীথ হেঁটে গেছে, কিন্তু ঝুল-মাখা ছোট একটি জানালার ফাঁক দিয়ে ছেঁড়া মশারির একটা প্রান্ত ও পেরেকে টাঙানো দাগ-ধরা একটা পাঞ্জাবির অংশ ছাড়া কিছুই আর তার চোখে পড়েনি।

সেই দিন রুগ্ন, ক্ষীণ কণ্ঠে শিশুর একটি স্তিমিত আর্তনাদ তার কানে এলো। বুকটা তার হু-হু করে উঠলো। বলতে কি, শিশুর সেই অসহায় কান্নায় মানুষের বেদনার সমস্ত ইতিহাস ও রহস্য নিশীথের কাছে এক মুহূর্তে অনাবৃত হয়ে দাঁড়ালো।

গ্যাসের আলোয় গলির যে মুখটা বিস্তৃত সেখানটায় একটু দূরে কাদের বাড়ির দেয়ালের আড়ালে নিশীথ আত্মগোপন করে ছিলো,

রাত্রির অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বেরিয়ে যেতে দিলো নির্মলকে, বুক-পকেট থেকে ওষুধের শিশিটা তার ঠেলে উঠছে। দেখা গেলো, মোড়ের পানের দোকানের কাছে সে একটা অচল সিকি ভাঙাবার চেষ্টা করছে। অচল, কেননা দোকানী সেটা নির্মলের দিকে সরাসরি ছুঁড়ে দিলো। অচল, কেননা নির্মলের হাবভাবে দরিদ্র একটা অপরাধের চেহারা।

গলিটা নিঃশব্দতায় যেন পাথর হয়ে আছে।

এবার আর নিশীথ দ্বিধা করলো না।

দুই হাতে পৃথিবীর সমস্ত সাহস ও স্নেহ ডেকে এনে সেই বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু-মৃদু টোকা দিলে।

এটা বোধহয় নির্মলের রীতি নয়, এইভাবে টোকা মারা। তাই ভিতর থেকে শিথিল, শূন্য গলায় কে জিগগেস করলে : 'কে?'

সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো ভাষা তৈরি হয়নি পৃথিবীতে। নিশীথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শুধু মৃদু-মৃদু টোকা ছাড়া আর যেন কিছুই বলা যায় না।

সমস্ত কিছু অপ্রত্যাশিতের জন্যে যেন সে প্রস্তুত, এমনি নিরুদ্বেগ, নিরাশ গলায় সে বললে, 'খোলাই আছে, চলে এসো।'

এটাও বোধহয় নির্মলের রীতি নয়, যেমন ক'রে ঠেলা দিয়ে দরজাটা সে খুলে ফেললে। নবনীতা মাটির উপর আসনের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলো, অপরিচিত পদশব্দে নির্বাক বিস্ময়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে।

তার মাঝে ঘর ও ঘরের মাঝে তাকে—নিশীথ দেখলো যেন এক কায়াহীন অখণ্ড অভিব্যক্তি। রেখা দিয়ে যেন তাকে বিচ্ছিন্ন, নির্দিষ্ট করা যাবে না। ঘরের কোথায় মাটির একটা স্তিমিত বাতি জ্বলছে, তারই প্রভাবে ঘরময় বিবর্ণ একটা আভা। নবনীতার পরনে ময়লা সংক্ষিপ্ত একটা শাড়ি, গায়ে ছিন্নতার বোঝা নোংরা ঐ একটা সেমিজ না থাকলে তাকে বোধকরি এমন পীড়িত দেখাতো না। শূন্যো

তক্তপোশের উপর রোরুদ্যমান রুগ্ন একটি শিশু ছাড়া কোথাও তার এতটুকু ঐশ্বর্যের লেশ নেই, না ঘরে, না শরীরে। তার গলাটা কেমন লম্বা, কাঁধ দুটো কেমন ঢিলে, কোমরটা কেমন সরু হয়ে এসেছে।

তার মুখ ভালো করে দেখবার জন্যে নিশীথ ঘরের বাতিটার পারিস্থিতি একবার সন্ধান করলো। দেখলো দেয়ালের থেকে তক্তপোশের যে-দিকটা ফাঁক, সেইখানে লজ্জিত আলোটা যেন নিবে যাবার জন্যে মিনতি করছে। নিবে যাওয়াই তার উচিত ছিলো, কেননা নিশীথের স্পষ্ট চোখে পড়লো সেই দীপালোকে নন্দদুলাল তেমনি*বাঁকা ঠামে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই তাঁর নিটোল ডৌল আর মসৃণ দৃঢ়তায়, আর তারই চারপাশে পুজোর ছোট-ছোট উপকরণ রয়েছে স্তূপীকৃত হয়ে। উপকরণ বলতে ছোট একটি পিতলের চাকতিতে গোটা কয়েক ফুল, আর একটাতে এক দলা চিনি, দেয়ালের ফাটলে গোঁজা জ্বলন্ত একটা ধূপের কাঠি, ছেঁড়া কলাপাতায় একটুখানি গলিত সিঁদুর। নবনীতা যে তন্ময়ের মতো কোথায় এতক্ষণ বসে ছিলো খুঁজে পেতে দেরি হলো না।

নিশীথ যেন চমৎকার আশ্বস্ত হলো এমনি সুপ্ত সহানুভূতি নিয়ে বললে, 'আমাকে চিনতে পারো?'

নবনীতার গলায় একবিন্দু সজলতা নেই। উদাসীনের মতো বললে, 'না চেনবার তো কোনো কথা নয়।'

নিশীথ মনের মধ্যে হারানো একটা সুর খুঁজে ফিরছিলো; বললে, 'কতোদিন পরে দেখা।'

'হ্যাঁ,' নবনীতা অশরীরীর মতো বললে, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা না হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আর দেখা হলেই বা আশ্চর্যের কী আছে?'

স্তব্ধ হয়ে নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেললো, তার মুখের শীর্ণতার দিকে চেয়ে বললে, 'কেমন আছ?'

'মন্দ কী?' নবনীতা দস্তুরমতো হাসলো, তাতে এতটুকু কপটতা নেই, বললে, 'মানুষে আবার কী রকম থাকে?'

'তোমার স্বামীর বুঝি আর কোনো চাকরি-বাকরি যোগাড় হলো না?' নিশীথ এটা এখন না জিগগেস করলেও পারতো, কিন্তু মুখ দিয়ে যেন কে ঠেলে বার করে দিলে।

'এটা একটা এমন কী আশ্চর্য কথা!'

'হ্যাঁ, আজকালকার দিনে চাকরি একবার গেলে—'

'ফের যোগাড় করা দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেটা আমি যে সামান্য মেয়েমানুষ, আমিও খুব ভালো জানি।' হাসির চেষ্টায় নবনীতার অধরে শীর্ণ একটি বিবর্ণতা ফুটে উঠলো।

নিজেকে ভারি ছোট মনে হতে লাগলো নিশীথের। এক মুহূর্ত সে কোনো কথা খুঁজে পেলো না, যেন কতোকাল সে স্তব্ধতার যন্ত্রণায় পাথর হয়ে আছে। কী বলবে কিছু ভেবে না পেয়েই যেন সে বললে, 'কিন্তু তুমি, তুমি তো চেষ্টা করলে একটা কিছু যোগাড় করতে পারো। তুমি তো আর বয়ে আসোনি।'

'চেষ্টা, কিছু চেষ্টা করে পেতে আমার ভালো লাগে না।'

ভিতর থেকে নিশীথের কে যেন মুখ চেপে ধরলো!

তবু বললে, 'তোমার শরীরও তো ভীষণ ভেঙে পড়েছে।'

'শরীর তো ভাঙবারই জন্যে।'

স্তব্ধতা।

নবনীতা যেন ঘরের দেয়ালকে সম্বোধন করে বললে, তেমনি নির্বাপিত গলায় : 'কেন এসেছ এখানে?'

যেন সামান্য কৌতূহল নিবারণের বেশি নয়। যেন ট্রেনের প্যাসেঞ্জারকে প্রশ্ন।

'তোমাকে দেখতে।' নিশীথ সেই চিরায়মান ম্লানতার মধ্যে নবনীতাকে আবার দেখলে।

'আমাকে তো দেখেছ। দেখনি?' নবনীতা চোখের শুভ্রতায় দীপ্ত জ্বলে উঠলো।

'কোথায়?'

'সেই নারায়ণগড়ে। মনে পড়ে না?'

'সেই দেখায় তুমি সম্পূর্ণ ছিলে না।'

'সেই দেখায় আমি বিশেষ ছিলুম।' নবনীতা দুই চোখে আরেকবার বিকীরণ করে উঠলো : 'এই দেখাটা তো শুধু তুচ্ছ যান্ত্রিক একটা বাস্তবতা, এতে কোনো মহত্ত্ব নেই, কিন্তু সেই দেখায় ছিলো আকাশচারী কল্পনার উৎসব। আমার মাঝে আর কী দেখবার আছে, যদি সেদিন না আমাকে দেখে থাকো?'

নিশীথ আজো যেন তার মাঝে সেই উত্তুঙ্গ মহিমাই দেখলে, সেই ঋজু মেরুদণ্ড, যা ভেঙে গেলেও অবনমিত হয়নি।

নিশীথ এক পা এগিয়ে এলো, বললে, 'এইখানে, তোমার এই তক্তপোশে একটু বসতে পারি?'

উদাসীন মুখে নবনীতা বললে, 'তার তো কোনো দরকার দেখি না।'

নিশীথ দাঁড়িয়ে রইলো। বললে, 'ওটি বুঝি তোমার ছেলে?'

'না, মেয়ে। ছেলে হয়েছিলো, বছর দুয়েক হয়ে মারা গেছে।'

'ওর বুঝি অসুখ?'

'সেটা ওকে না দেখেও বলা যায়।'

'ওষুধ খাওয়াও না?'

'চেষ্টা করি।' নবনীতা ঝরঝর করে হেসে ফেললো : 'কিন্তু মাঝে-মাঝে ওর বাবা রাস্তার মাঝেই আধ-শিশিটাক খেয়ে ফেলে।'

'তুমি খুব কষ্টে পড়েছ, নবনী।' অবরুদ্ধ ব্যাকুলতায় নিশীথের গলা কেঁপে উঠলো।

'তা পড়লুমই বা। সেটা আর এমন বিচিত্র কী।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু মন্দ কী, কষ্টটাও তো আমারই।'

'কিন্তু তোমার এ-সবে কোনোদিন অভ্যেস ছিলো না।'

'সেই জন্যেই তো অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগছে।' নবনীতা এতটুকু ভান করলো না : 'একদিন যে মরবো, একান্ত করে সে তো আমারই মরা, তখন তো অভ্যেস নেই বলেই নিদারুণ মজা লাগবে।'

নিশীথ শুকনো গলায় একটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'আমাকে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল দিতে পারো?'

'তেষ্টা পেয়েছে?'

'জানি না। দিতে পারো কিনা বলো।'

'পারি। কিন্তু জলটা ঠিক ঠাণ্ডা হবে কিনা বলতে পারি না।' নবনীতা তক্তপোশের তলায় কলসী থেকে গড়িয়ে কাঁসার গ্লাশে করে জল ভরে আনলো।

গ্লাশের গায়ে তার পাঁচটি আঙুলের শুভ্র শীর্ণতা নিশীথকে যেন অলক্ষ্যে একবার আকর্ষণ করলো। কিন্তু সেই পবিত্রতা তার স্পর্শের চেয়ে অনেক দূরে।

জলটা সে নিঃশেষে খেয়ে ফেললো। গ্লাশটা আবার নবনীতার নির্লিপ্ত হাতে তেমনি ফিরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো—'

'না, আমি একেবারে মনে করি না।' নবনীতা তরল গলায় বললে।

'কাকে?'

'কাউকে না। আমি দিব্যি বেঁচে থাকতে পারছি, প্রগাঢ়, পরিপূর্ণ।'

'না,' পকেট থেকে নিশীথ এক তাড়া নোট বার করলো, বললে, 'এগুলো তুমি নাও, তাতে কিছু তোমার লজ্জা নেই, তোমার খুকির চিকিৎসা—'

'ওগুলো আর আমার সামনে এনো না।' নবনীতার মুখ বিতৃষ্ণায় শাদা।

'আমি তো তোমাকে দিচ্ছি।'

নিশীথের সেই জোর নবনীতা এক নিমেষে চূর্ণ করে দিলো। বললে, 'যা আমি জোর করে কেড়ে ছিনিয়ে নিতে না পারি তাতে আমার স্পৃহা নেই।'

'কিন্তু এ তো তুমি একরকম জোর করেই নিচ্ছ।' নিশীথ বললে।

'কিন্তু তার মাঝে তোমার ক্ষতির তীব্রতা নেই, নেই আমার লোভের প্রাখর্য।'

মুহূর্তে নিশীথ কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। ব্যঙ্গ করে বললে, 'তুমি জানো কিনা জানি না, সেই জন্যেই তোমার আজকের এই অবস্থা।'

কৃশ মুখে সেই হাসিটি ভারি করুণ দেখালো। নবনীতা বললে, 'আমার চেয়ে তা আর বেশি কে জানে? মরবো জানি বলেই তো জীবনের এত স্বাদ। বেশ তো, তাই যদি হয়, তবে এই অবস্থাটাই আমাকে আনুপূর্বিক সম্ভোগ করতে দাও না।'

'তবে তুমি বলতে চাও তোমার টাকার দরকার নেই?'

'বললেও বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলবো, না, নেই।'

'মিথ্যে কথা। তাই তো আজ ঐ দেবতার মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে ভিক্ষা করতে বসেছ।'

ঘরের প্রত্যেকটি ইঁট যেন অট্টহাস্য করে উঠলো। নবনীতা নিশীথের দিকে অকুণ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিলো হয়তো বা তার লোলুপ শীর্ণতায়। বললে, 'আর দেবতার কাছে ভিক্ষা করার জন্যে তুমি উপস্থিত হয়েছ মূর্তিমান দেবতা। দাও, টাকার কার না দরকার? ও একটা লোকের মৌখিক বানানো কথামাত্র—আমার ঘরের এই কদাকার নারকীয় চেহারা দেখে কেউ সন্দেহ করবে যে আমি ঘোরতর কষ্টে পড়িনি, আমার মেয়েটা ওষুধ দূরে থাক, পথ্য পাচ্ছে না, পাশের বাড়ি থেকে চাল যোগাড় হলেও বাজার থেকে মাটির একটা হাঁড়ি পাচ্ছি না হয়তো

যোগাড় করতে। দাও, দেবতার আশীর্বাদ কখনো ফিরিয়ে দিতে নেই।'

তাড়ায় বাঁধা দশ টাকার দশখানা নোট ছিলো, তাই প্রসারিত করে যন্ত্রচালিতের মতো নিশীথ নবনীতার হাতে সঁপে দিলো।

নবনীতা ম্লান হেসে বললে, 'বেশ, তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

'না, যাই।'

রাস্তায় নেমে এলো নিশীথ, আর রাস্তায় নেমে আসতেই নবনীতা সেই নোটগুলি ত্বরিত আঙুলে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে নিশীথের গায়ের উপর রাস্তার চারপাশে ছুঁড়ে দিলো।

ব্যাপারটা নিশীথের আয়ত্ত করবার আগেই দরজা দিলে বন্ধ করে।

শেষ